আল কাসাস

২৮

নামকরণ

২৫ আয়াতের وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ বাক্যংশ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরায় الْقَصَص শব্দটি এসেছে। আভিধানিক অর্থে কাসাস বলতে ধারাবাহিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করা বুঝায়। এ দিক দিয়ে এ শব্দটি অর্থের দিক দিয়েও এ সূরার শিরোনাম হতে পারে। কারণ এর মধ্যে হযরত মূসার কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরা নাম্‌লের ভূমিকায় আমি ইবনে আব্বাস (রা) ও জাবের ইবনে যায়দের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করে এসেছি। তাতে বলা হয়েছিল, সূরা শু'আরা, সূরা নামূল ও সূরা কাসাস একের পর এক নাযিল হয়। ভাষা, বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু থেকেও একথাই অনুভূত হয় যে, এ তিনটি সূরা প্রায় একই সময় নাযিল হয়। আবার এদিক দিয়েও এদের মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে যে, এ সূরাগুলোতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীর যে বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো পরস্পর মিলিত আকারে একটি পূর্ণ কাহিনীতে পরিণত হয়ে যায়। সূরা শু'আরায় নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করে হযরত মূসা বলেন ঃ "ফেরাউনী জাতির বিরুদ্ধে একটি অপরাধের জন্য আমি দায়ী। এ কারণে আমার ভয় হচ্ছে, সেখানে গেলেই তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।" তারপর হযরত মূসা যখন ফেরাউনের কাছে যান তখন সে বলে ঃ "আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে ছোট্ট শিশুটি থাকা অবস্থায় লালন পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের এখানে কয়েক বছর থাকার পর যা করে গেছো তাতো করেছই।" এ দু'টি কথার কোন বিস্তারিত বর্ণনা সেখানে নেই। এ সূরায় তার বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। অনুরূপভাবে সূরা নাম্‌লে এ কাহিনী সহসা একথার মাধ্যমে শুরু হচ্ছে যে, হযরত মূসা তাঁর পরিবার পরিজনদের নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ তিনি একটি আগুন দেখলেন। এটা কোন্ ধরনের সফর ছিল, তিনি কোথায় থেকে আসছিলেন এবং কোথায় যাচ্ছিলেন এর কোন বিবরণ সেখানে নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ এ সূরায় পাওয়া যায়। এভাবে এ তিনটি সূরা মিলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে যেসব ওজুহাত পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো নাকচ করে দেয়া।

এ উদ্দেশ্যে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে হযরত মূসার কাহিনী। সূরা নাযিলের সময়কালীন অবস্থার সাথে মিলে এ কাহিনী স্বতস্ফূর্তভাবেই শ্রোতার মনে কতিপয় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় :

এক : আল্লাহ যা কিছু করতে চান সে জন্য তিনি সবার অলক্ষ্যে কার্যকারণ ও উপায়–উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে শিশুর হাতে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের রাজত্বের অবসান ঘটবার কথা, তাকে আল্লাহ স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে তার নিজের হাতেই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন এবং ফেরাউন জানতে পারেনি সে কাকে প্রতিপালন করছেন। সেই আল্লাহর ইচ্ছার সাথে কে লড়াই করতে পারে এবং তাঁর মোকবিলায় কার কৌশল সফল হতে পারে!

দুই : কোন বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে কাউকে এ নবুওয়াত দান করা হয় না। তোমরা অবাক হচ্ছো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথা থেকে চুপিচুপি এ নবুওয়াত লাভ করলেন এবং ঘরে বসে বসে তিনি কেমন করে নবী হয়ে গেলেন। কিন্তু তোমরা নিজেরাই যে মূসা আলাইহিস সালামের বরাত দিয়ে থাক যে, لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى (৪৮ আয়াত) তিনিও এভাবে পথে চলার সময় নবুওয়াত লাভ করেছিলেন এবং সেদিন সিনাই পাহাড়ের নিঝুম উপত্যকায় কি ঘটনা ঘটে গেলো তা ঘূণাক্ষরেও কেউ জানতে পারলো না। মূসা নিজেও এক সেকেণ্ড আগে জানতেন না তিনি কি জিনিস পেতে যাচ্ছেন। যাচ্ছিলেন আগুন আনতে, পেয়ে গেলেন পয়গম্বরী।

তিন : যে বান্দার সাহায্যে আল্লাহ কোন কাজ নিতে চান, কোন দলবল–সেনাবাহিনী ও সাজ–সরঞ্জাম ছাড়াই তার উত্থান ঘটে থাকে। কেউ তাঁর সাহায্যকারী হয় না। বাহ্যত তার কাছে কোন শক্তির বহর থাকে না। কিন্তু বড় বড় দলবল, সেনাবাহিনী ও সাজ–সরঞ্জাম ওয়ালারা শেষ পর্যন্ত তার মোকাবিলায় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়। তোমরা আজ তোমাদের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যে আনুপাতিক পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো তার চেয়ে অনেক বেশী পার্থক্য ছিল মূসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের শক্তির মধ্যে। কিন্তু দেখে নাও কে জিতলো এবং কে হারলো।

চার : তোমরা বার বার মূসার বরাত দিয়ে থাকো। তোমরা বলে থাকো, মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা মুহাম্মাদকে দেয়া হলো না কেন? অর্থাৎ লাঠি, সাদা হাত ও অন্যান্য প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ। ভাবখানা এ রকম যেন তোমরা ঈমান আনার জন্য তৈরি হয়েই বসে আছো, এখন শুধু তোমাদেরকে সেই মু'জিযাগুলো দেখাতে হবে যা মূসা ফেরাউনকে দেখিয়েছিলেন। তোমরা তার অপেক্ষায় রয়েছো। কিন্তু যাদেরকে এসব মু'জিযা দেখানো হয়েছিল তারা কি করেছিল তা কি তোমরা জানো? তারা এগুলো দেখেও ঈমান আনেনি। তারা নির্দ্বিধায় বলেছিল, এসব জাদু। কারণ তারা সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এই একই রোগে আজ তোমরাও ভুগছো। তোমরা কি ঐ ধরনের মু'জিযা দেখে ঈমান আনবে? তারপর তোমরা কি এ খবরও রাখো, যারা ঐ মু'জিযা দেখে সত্যকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এখন তোমরাও কি একই প্রকার হঠকারিতা সহকারে মু'জিযার দাবী জানিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাচ্ছো?

মক্কার কুফরী ভারাক্রান্ত পরিবেশে যে ব্যক্তি হযরত মূসার এ কাহিনী শুনতো তার মনে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আপনা আপনিই একথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যেতো। কারণ সেসময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে ঠিক তেমনি ধরনের একটি দ্বন্দ্ব–সংঘাত চলছিল যেমন ইতিপূর্বে চলেছিল ফেরাউন ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে। এ অবস্থায় এ কাহিনী শুনাবার অর্থ ছিল এই যে, এর প্রত্যেকটি অংশ সম সাময়িক অবস্থার ওপর আপনা আপনি প্রযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। যদি এমন একটি কথাও না বলা হয়ে থাকে যার মাধ্যমে কাহিনীর কোন্ অংশটি সে সময়ের কোন্ অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল তা জানা যায়, তাহলেও তাতে কিছু এসে যায় না।

এরপর পঞ্চম রুকূ' থেকে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা শুরু হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মী তথা নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও দু'হাজার বছর আগের ঐতিহাসিক ঘটনা একেবারে হুবহু শুনিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর শহর ও তাঁর বংশের লোকেরা ভালোভাবেই জানতো, তাঁর কাছে এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত কোন উপায় উপকরণ ছিল না। প্রথমে এ বিষয়টিকে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

তারপর তাঁকে নবুওয়াত দান করার ব্যাপারটিকে তাদের পক্ষে আল্লাহর রহমত হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ তারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের সৎপথ দেখাবার জন্য এ ব্যবস্থা করেন।

তারপর তারা বারবার "এই নবী এমন সব মু'জিযা আনছেন না কেন? যা ইতিপূর্বে মূসা এনেছিলেন।" এ মর্মে যে অভিযোগ করছিল তার জবাব দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়, মূসার ব্যাপারে তোমরা স্বীকার করছো যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযা এনেছিলেন। কিন্তু তাঁকেই বা তোমরা কবে মেনে নিয়েছিলে? তাহলে এখন এ নবীর মু'জিযার দাবী করছো কেন? তোমরা যদি প্রবৃত্তির কামনা–বাসনার দাসত্ব না করো, তাহলে সত্য এখনো তোমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি এ রোগে ভুগতে থাকো, তাহলে যে কোন মু'জিযা আসুক না কেন তোমাদের চোখ খুলবে না।

তারপর সে সময়কার একটি ঘটনার ব্যাপারে মক্কার কাফেরদেরকে শিক্ষা ও লজ্জা দেয়া হয়েছে। ঘটনাটি ছিল ঃ সে সময় বাইর থেকে কিছু খৃস্টান মক্কায় আসেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে কুরআন শুনে ঈমান আনেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা নিজেদের গৃহের এ নিয়ামত থেকে লাভবান তো হলোই না। উপরন্তু আবু জেহেল প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে।

সবশেষে মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা না মানার জন্য তাদের পক্ষ থেকে যে আসল ওযর পেশ করতো সে প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। তারা বলতো, যদি আরববাসীদের প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে আমরা এ নতুন তাওহীদী ধর্ম গ্রহণ করি, তাহলে সহসাই এদেশ থেকে আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। তখন আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছুবে যার ফলে আমরা আরবের সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী গোত্রের মর্যাদা হারিয়ে বসবো এবং এ

ভূ–খণ্ডে আমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থলও থাকবে না। এটিই ছিল কুরাইশ সরদারদের সত্য বৈরিতার মূল উদ্যোক্তা। অন্যান্য সমস্ত সন্দেহ, অভিযোগ, আপত্তি ছিল নিছক বাহানাবাজী। জনগণকে প্রতারিত করার জন্য তারা সেগুলো সময়মতো তৈরী করে নিতো। তাই আল্লাহ সূরার শেষ পর্যন্ত এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এক একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এমন সমস্ত মৌলিক রোগের চিকিৎসা করেছেন যেগুলোর কারণে তারা পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থের দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার ফায়সালা করতো।

طسٓمٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٣ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٤

তা–সীন–মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি মূসা ও ফেরাউনের কিছু যথাযথ বৃত্তান্ত তোমাকে শুনাচ্ছি[১] এমনসব লোকদের সুবিধার্থে যারা ঈমান আনে।[২]

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ফেরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে[৩] এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়।[৪] তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে সে লাঞ্ছিত করতো, তাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো।[৫] আসলে সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল।

১. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল বাকারাহ ৬ রুকূ', আল আ'রাফ ১৩–১৬ রুকূ', ইউনুস ৮–৯ রুকূ', হূদ ৯ রুকূ', বনী ইসরাঈল ১২ রুকূ', মার্‌য়াম ৪ রুকূ', তা–হা ১–৪ রুকূ, আল মু'মিনুন ৩ রুকূ', আশ্‌ শু'আরা ২–৪ রুকূ', আন্‌ নাম্‌ল ১ রুকূ', আল আনকাবুত ৪ রুকূ, আল মুমিন ৩–৫ রুকূ, আয্‌ যুখ্‌রুফ ৫ রুকূ', আদ্‌ দুখান ১ রুকূ', আয্‌ যারিয়াত ২ রুকূ, এবং আন্‌নাযিআ'ত ১ রুকূ'।

২. অর্থাৎ যারা কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে কথা শুনানো তো অর্থহীন। তবে যারা মনের দুয়ারে এক গুঁয়েমীর তালা ঝুলিয়ে রাখে না। এ আলোচনায় তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

৩. মূলে عَلَا فِى الْاَرْضِ শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সে পৃথিবীতে মাথা উঠিয়েছে, বিদ্রোহাত্মক নীতি অবলম্বন করেছে, নিজের আসল মর্যাদা অর্থাৎ দাসত্বের স্থান থেকে উঠে স্বেচ্ছাচারী ও প্রভুর রূপ ধারণ করেছে, অধীন হয়ে

থাকার পরিবর্তে প্রবল হয়ে গেছে এবং স্বৈরাচারী ও অহংকারী হয়ে জুলুম করতে শুরু করেছে।

৪. অর্থাৎ তার রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী আইনের চোখে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকারও দেয়া হয়নি। বরং সে সভ্যতা–সংস্কৃতি ও রাজনীতির এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীন করে পদানত, পর্যুদস্ত, নিষ্পেষিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়।

এখানে কারো এ ধরনের সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে, ইসলামী রাষ্ট্রেও তো মুসলিম ও জিম্মীর মধ্যে ফারাক করা হয় এবং তাদের অধিকার ও ক্ষমতাও সকল দিক দিয়ে সমান রাখা হয়নি। এ সন্দেহ এজন্য সঠিক নয় যে, ফেরাউনী বিধানে যেমন বংশ, বর্ণ, ভাষা বা শ্রেণীগত বিভেদের ওপর বৈষম্যের ভিত্ রাখা হয়েছে ইসলামী বিধানে ঠিক তেমনটি নয়। বরং ইসলামী বিধানে নীতি ও মতবাদের ওপর এর ভিত রাখা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যিম্মী ও মুসলমানের মধ্যে আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে মোটেই কোন ফারাক নেই। সকল পার্থক্য একমাত্র রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে। আর এ পার্থক্যের কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, একটি আদর্শিক রাষ্ট্রে শাসকদল একমাত্র তারাই হতে পারে যারা হবে রাষ্ট্রের মূলনীতির সমর্থক। এদলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি শামিল হতে পারে যে এ মুলনীতি মেনে নেবে এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এর বাইরে অবস্থান করবে যে এ মূলনীতি মেনে নেবে না। এ পার্থক্য ও ফেরাউনী ধরনের পার্থক্যের মধ্যে কোন মিল নেই। কারণ, ফেরাউনী পার্থক্যের ভিত্তিতে পরাধীন প্রজন্মের কোন ব্যক্তি কখনো শাসক দলে শামিল হতে পারে না। সেখানে পরাধীন প্রজন্মের লোকেরা রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার তো দূরের কথা মৌলিক মানবিক অধিকারও লাভ করে না। এমন কি জীবিত থাকার অধিকারও তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। সেখানে কখনো পরাধীনদের জন্য কোন অধিকারের জামানত দেয়া হয় না। সব ধরনের স্বার্থ, মুনাফা, সুযোগ–সুবিধা ও মর্যাদা একমাত্র শাসক সমাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এবং এ বিশেষ অধিকার একমাত্র শাসক জাতির মধ্যে জন্মলাভকারী ব্যক্তিই লাভ করে।

৫. বাইবেলে এর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঃ "পরে মিসরের উপরে এক নতুন রাজা উঠিলেন, তিনি যোষেফকে জানিতেন না। তিনি আপন প্রজাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমাদের অপেক্ষা ইস্রায়েল–সন্তানদের জাতি বহু সংখ্যক ও বলবান; আইস, আমরা তাহাদের সহিত বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার করি, পাছে তাহারা বাড়িয়া উঠে,এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারাও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, এবং এদেশ হইতে প্রস্থান করে। অতএব তাহারা ভার বহন দ্বারা উহাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য উহাদের উপরে কার্য্য শাসকদিগকে নিযুক্ত করিল। আর উহারা ফরৌণের নিমিত্ত ভাণ্ডারের নগর পিথোম ও রামিষেষ গাঁথিল। কিন্তু উহারা তাহাদের দ্বারা যত দুঃখ পাইল, ততই বৃদ্ধি পাইতে ও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল; তাই ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়ে তাহারা অতিশয়

وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِينَ ۝ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝

আমি সংকল্প করেছিলাম, যাদেরকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবো, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করবো,[৬] তাদেরকেই উত্তরাধিকারী করবো,[৭] পৃথিবীতে তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করবো। এবং তাদের থেকে ফেরাউন, হামান [৮] ও তার সৈন্যদেরকে সে সবকিছুই দেখিয়ে দেবো, যার আশংকা তারা করতো।

উদ্বিগ্ন হইল। আর মিস্রীয়েরা নির্দয়তা পূর্বক ইস্রায়েল সন্তানদিগকে দাস্যকর্ম করাইল, তাহারা কর্দম, ইষ্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কার্যে কঠিন দাস্যকর্ম দ্বারা উহাদের প্রাণ তিক্ত করিতে লাগিল। তাহারা উহাদের দ্বারা যে যে দাস্যকর্ম–করাইত, সে সমস্ত নির্দয়তা পূর্বক করাইত। পরে মিসরের রাজা শিফ্রা নামে ও পূয়া নামে দুই ইব্রীয়া ধাত্রীকে একথা কহিলেন, যে সময়ে তোমরা ইব্রীয় স্ত্রীলোকদের ধাত্রী কার্য করিবে ও তাহাদিগকে প্রসব আধারে দেখিবে, যদি পুত্র সন্তান হয়, তাহাকে বধ করিবে; আর যদি কন্যা হয়, তাহাকে জীবিত রাখিবে।" (যাত্রাপুস্তক ১ ঃ ৮–১৬)

এ থেকে জানা যায়, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগ অতিক্রান্ত হবার পর মিসরে একটি জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এবং কিবতীদের হাতে যখন পুনর্বার শাসন ক্ষমতা এসেছিল তখন নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার বনী ইসরাঈলের শক্তি নির্মূল করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত এবং তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের সেবা কর্মের জন্য নির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি বরং এ থেকে আরো অগ্রসর হয়ে তাদের ছেলেদের হত্যা করে কেবলমাত্র মেয়েদের জীবিত রাখার নীতি অবলম্বন করা হয়, যাতে করে তাদের মেয়েরা ধীরে ধীরে কিবৃতীদের কর্তৃত্বাধীনে এসে যেতে থাকে এবং তাদের থেকে ইসরাঈলের পরিবর্তে কিবতীদের বংশ বিস্তার লাভ করে। তালমূদ এর আরো বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছে যে, হযরত ইউসুফের ইন্তিকালের সময় থেকে একশতকের কিছু বেশী সময় অতিক্রান্ত হবার পর এ বিপ্লব আসে। সেখানে বলা হয়েছে, নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার প্রথমে বনী ইসরাঈলকে তাদের উর্বর কৃষিক্ষেত, বাসগৃহ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী পদ থেকে বেদখল করে দেয়। এরপরও যখন কিবৃতী শাসকরা অনুভব করে যে, বনী ইসরাঈল ও তাদের সমধর্মাবলম্বী মিসরীয়রা যথেষ্ট শক্তিশালী তখন তারা ইসরাঈলীদেরকে লাঞ্ছিত ও হীনবল করতে থাকে এবং তাদের থেকে কঠিন পরিশ্রমের কাজ সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বা বিনা পারিশ্রমিকেই নিতে থাকে। কুরআনে এক

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

আমি[৯] মূসার মাকে ইশারা করলাম, "একে স্তন্যদান করো, তারপর যখন এর প্রাণের ভয় করবে তখন একে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে এবং কোন ভয় ও দুঃখ করবে না, তাকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূলদের অন্তরভুক্ত করবো।"[১০] শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের পরিবারবর্গ তাকে (দরিয়া থেকে) উঠিয়ে নিল, যাতে সে তাদের শত্রু এবং তাদের দুঃখের কারণ হয়।[১১] যথার্থই ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যরা (তাদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে) ছিল বড়ই অপরাধী। ফেরাউনের স্ত্রী (তাকে) বললো, "এ শিশুটি আমার ও তোমার চোখ জুড়িয়েছে। কাজেই একে হত্যা করো না, বিচিত্র কি সে আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।"[১২] আর তারা (এর পরিণাম) জানতো না।

জায়গায় বলা হয়েছে যে, "তারা মিসরের অধিবাসীদের একটি গোষ্ঠীকে লাঞ্ছিত ও হীনবল করতো" এ বক্তব্য সেই উক্তির ব্যাখ্যা বিবেচিত হতে পারে। আর সূরা আল বাকারায় আল্লাহ যে বলেছেন, ফেরাউনের বংশধররা বনী ইসরাঈলকে কঠোর শাস্তি দিতো। يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ এরও ব্যাখ্যা এটিই।

কিন্তু বাইবেল ও কুরআনে এ ধরনের কোন আলোচনা নেই যাতে বলা হয়েছে যে, কোন জোতিষী ফেরাউনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈলে একটি শিশু জন্ম নেবে, তার হাতে ফেরাউনী কর্তৃত্বের মৃত্যু ঘটবে এবং এ বিপদের পথ রোধ করার জন্য ফেরাউন ইসরাঈলীদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। অথবা ফেরাউন কোন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছিল এবং তার তা'বীর এভাবে দেয়া হয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ ধরনের বিশেষ গুণ বিশিষ্ট শিশু জন্ম নেবে। তালমূদ ও অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এ কাহিনী আমাদের মুফাস্‌সিরগণ উদ্ধৃত করেছেন। (দেখুন জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, নিবন্ধ "মূসা" এবং The Talmud selections. P.123-24)

৬. অর্থাৎ তাদেরকে দুনিয়ায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করবো।

৭. অর্থাৎ তাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকার দান করবো এবং তারা হবে রাষ্ট্র পরিচালক ও শাসনকর্তা।

৮. পশ্চিমা প্রাচ্যবিদরা এ বিষয়টি নিয়ে বেশ ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন যে, হামান তো ছিল ইরানের বাদশাহ আখ্‌সোবীরাস অর্থাৎ খাশিয়ারশার (Xerxes) দরবারের একজন আমীর। আর এ বাদশাহর আমল হযরত মূসার শত শত বছর পরে খৃঃ পূঃ ৪৮৬ ও ৪৬৫ সালে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন তাকে মিসরে নিয়ে গিয়ে ফেরাউনের মন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছে। তাদের বিবেকবুদ্ধি যদি বিদ্বেষের আবরণে আচ্ছাদিত না থাকতো, তাহলে তারা নিজেরাই এ বিষয়টি ভেবে দেখতে পারতো। আখসোবীরাসের সভাসদ হামানের পূর্বে দুনিয়ায় এ নামে আর কোন ব্যক্তি কোথাও ছিল কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলার মতো তাদের কাছে কি এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে? যে ফেরাউনের আলোচনা এখানে হচ্ছে যদি তার সমস্ত মন্ত্রী, আমীর–উমরাহ ও সভাসদদের কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকা একেবারে নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোন প্রাচ্যবিদ সাহেব পেয়ে গিয়ে থাকেন, যাতে হামানের নাম নেই, তাহলে তিনি তা লুকিয়ে রেখেছেন কেন? এখনই তার ফটোকপি তাঁর ছাপিয়ে দেয়া উচিত। কারণ কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এর চেয়ে বড় প্রভাবশালী অস্ত্র আর তিনি পাবেন না।

৯. মাঝখানে এ আলোচনা উহ্য রাখা হয়েছে যে, এ অবস্থায় এক ইসরাইলী পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হয়, সারা দুনিয়া যাকে মূসা আলাইহিস সালাম বলে জানে। বাইবেল ও তালমুদের বর্ণনা অনুযায়ী এটি ছিল হযরত ইয়াকুবের পুত্র লাভীর সন্তানদের মধ্য থেকে কারোর পরিবার। ঐ গ্রন্থ দু'টিতে হযরত মূসার পিতার নাম বলা হয়েছে ঈমরাম। কুরআন একেই ঈমরান শব্দের মাধ্যমে উচ্চারণ করেছে। মূসা আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে তাঁদের আরো দু'টি সন্তান হয়েছিল। সবচেয়ে বড় মেয়েটির নাম ছিল মারয়াম (Miriam)। তার আলোচনা সামনের দিকে আসছে। তার ছোট ছিল হযরত হারুন। সম্ভবত বনী ইসরাঈলী পরিবারে কোন পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তাকে হত্যা করতে হবে—এই ফেরাউনী নির্দেশনামা জারী হবার পূর্বে হযরত হারুনের জন্ম হয়েছিল। তাই তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। এরপর এ আইন জারী হয় এবং ভয়ংকর পরিবেশে তৃতীয় সন্তানের জন্ম হয়।

১০. অর্থাৎ জন্মের সাথে সাথেই সাগরে ভাসিয়ে দেবার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং বলা হয়, যতক্ষণ ভয়ের কারণ না থাকে শিশুকে স্তন্য দান করতে থাকো। যখন গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে গেছে বলে মনে হবে এবং আশংকা দেখা দেবে শিশুর আওয়াজ শুনে বা অন্য কোনভাবে শত্রুরা তার জন্মের কথা জানতে পারবে অথবা স্বয়ং বনী ইসরাঈলীদের কোন নীচ ব্যক্তি গোয়েন্দাগিরী করবে, তখন নির্ভয়ে ও নিশংকচিত্তে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে তাকে সাগরে ভাসিয়ে দেবে। বাইবেলের বর্ণনা মতে জন্মের পর তিন মাস পর্যন্ত হযরত মূসার মা তাকে লুকিয়ে রাখেন। তালমুদ এর ওপর আরো বাড়তি খবর দিয়েছে যে, ফেরাউন সরকার সে সময় নারী গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিল। তারা নিজেদের সাথে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে ইসরাঈলী পরিবারে যেতো এবং কোন না কোনভাবে তাদেরকে সেখানে কাঁদাতো। এর ফলে কোন ইসরাঈলী যদি সেখানে কোন শিশুকে লুকিয়ে রেখে থাকতো, তাহলে অন্য শিশুর কান্না শুনে সেও কাঁদতো। এই নতুন ধরনের গোয়েন্দাগিরী

হযরত মূসার মাকে পেরেশান করে দেয়। তিনি নিজ পুত্রের প্রাণ বাঁচাবার জন্য জন্মের তিন মাস পরে তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেন। এ পর্যন্ত এ দু'টি গ্রন্থের বর্ণনা কুরআনের সাথে মিলে যায়। আর দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবার অবস্থাও তারা ঠিক একই ধরনের বর্ণনা করেছে যা কুরআনে বলা হয়েছে। সূরা তা–হা এ বলা হয়েছে ঃ اَقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ "শিশুকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও।" বাইবেল ও তালমূদ এরি সমর্থন করে। তাদের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত মূসার মাতা নলখাগড়ার একটি ঝুড়ি বানিয়ে তার গায়ে তৈলাক্ত মাটি ও আলকাতরা লেপন করে তাদের পানি থেকে সংরক্ষিত করে। তারপর হযরত মূসাকে তার মধ্যে শায়িত করে নীল নদের বুকে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে তার কোন উল্লেখ ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোতে নেই। অর্থাৎ হযরত মূসার মাতা আল্লাহর ইশারায় এ কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ পূর্বেই তাঁকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা দান করেছিলেন যে, এভাবে কাজ করলে শুধু তোমার পুত্রের প্রাণের কোন আশংকাই থাকবে না তাই নয় বরং আমি শিশুকে আবার তোমার কাছেই ফিরিয়ে আনবো এবং তোমার এ শিশু ভবিষ্যতে রসূলের মর্যাদা লাভ করবে।

১১. এটা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং এ ছিল তাদের কাজের পরিণাম। যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তারা এমন এক শিশুকে উঠাচ্ছিল যার হাতে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস হতে হবে।

১২. এ বর্ণনা থেকে বিষয়টির যে চিত্র স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, সিন্দুক বা ঝুড়ি নদীতে ভাসতে ভাসতে যখন ফেরাউনের প্রাসাদের কাছে চলে আসে তখন ফেরাউনের চাকর বাকররা তা ধরে ফেলে এবং উঠিয়ে নিয়ে বাদশাহ ও বেগমের সামনে পেশ করে। সম্ভবত বাদশাহ ও বেগম সে সময় নদীর কিনারে পরিভ্রমণ রত ছিলেন এমন সময় ঝুড়িটি তাদের চোখে পড়ে এবং তাদের হুকুমে সেটিকে নদী থেকে উঠানো হয়। তার মধ্যে একটি শিশু রাখা আছে দেখে অতি সহজে এ অনুমান করা যেতে পারতো যে, নিসন্দেহে এটি কোন ইসরাঈলীর সন্তান হবে। কারণ ইসরাঈলী জনবসতির দিক থেকে ঝুড়িটি আসছিল এবং সে সময় তাদের পুত্র সন্তানদেরকেই হত্যা করা হচ্ছিল। তাদের সম্পর্কেই ধারণা করা যেতে পারতো যে, কেউ তার সন্তানকে লুকিয়ে কিছুদিন লালন পালন করার পর এখন যখন দেখছে আর লুকানো যাবে না তখন এ আশায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে যে, হয়তো এ ভাবে সে প্রাণে বেঁচে যাবে এবং কেউ তাকে উঠিয়ে নিয়ে লালন পালন করবে। এ কারণে কিছু অতি বিশ্বস্ত গোলাম পরামর্শ দেয় যে, হুজুর! একে এখনই হত্যা করুন, এটাও তো কোন সাপেরই বাচ্চা। কিন্তু ফেরাউনের স্ত্রী তো ছিলেন একজন নারীই এবং হয়তো তিনি নিসন্তান ছিলেন। তারপর শিশুও ছিল বড়ই মিষ্টি চেহারার। যেমন সূরা তা–হা–য় আল্লাহ নিজেই হযরত মূসাকে বলছেন ঃ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ (আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করে দিয়েছিলাম) অর্থাৎ তোমাকে এমন প্রিয় দর্শন ও মনোমুগ্ধকর চেহারা দান করেছিলাম যে, দর্শনকারীরা স্বতস্ফূর্তভাবে তোমাকে আদর করতো। তাই মহিলা আত্ম সম্বরণ করতে পারেননি। তিনি বলে ওঠেন, একে হত্যা করো না বরং উঠিয়ে নিয়ে প্রতিপালন করো। সে যখন আমাদের এখানে প্রতিপালিত হবে এবং আমরা তাকে নিজের পুত্র করে

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا
أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ
قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ
الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ
لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

ওদিকে মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়েছিল। সে তার রহস্য প্রকাশ করে দিতো যদি আমি তার মন সুদৃঢ় না করে দিতাম, যাতে সে (আমার অংগীকারের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপনকারীদের একজন হয়। সে শিশুর বোনকে বললো, এর পিছনে পিছনে যাও। কাজেই সে তাদের (শত্রুদের) অজ্ঞাতসারে তাকে দেখতে থাকলো।[১৩] আর আমি পূর্বেই শিশুর জন্য স্তন্য দানকারিনীদের স্তন পান হারাম করে রেখেছিলাম।[১৪] (এ অবস্থা দেখে) সে মেয়েটি তাদেরকে বললো, "আমি তোমাদের এমন পরিবারের সন্ধান দেবো যারা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে এবং এর কল্যাণকামী হবে?"[১৫] এভাবে আমি মূসাকে[১৬] তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে তার চোখ শীতল হয়, সে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয় এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য বলে জেনে নেয়।[১৭] কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না।

নেবো তখন সে যে ইসরাঈলী সেকথা সে আর কেমন করে জানবে। সে নিজেকে ফেরাউন বংশেরই একজন মনে করবে এবং তার যোগ্যতাগুলো বনী ইসরাঈলের পরিবর্তে আমাদের কাজে লাগবে।

বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা মতে যে ভদ্রমহিলা হযরত মূসাকে লালন পালন করা ও পুত্রে পরিণত করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন তিনি ফেরাউনের স্ত্রী নন বরং তাঁর কন্যা ছিলেন। কিন্তু কুরআন পরিষ্কার ভাষায় তাকে বলছে امراة فرعون (ফেরাউনের স্ত্রী)। আর একথা সুস্পষ্ট যে, শত শত বছর পরে মুখে মুখে রটে যাওয়া লোক কাহিনীর তুলনায় সরাসরি আল্লাহর বর্ণিত ঘটনাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য হতে পারে। অযথা ইসরাঈলী বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য আরবী পরিভাষা ও প্রচলিত বাকরীতির বিরুদ্ধে امراة فرعون এর অর্থ "ফেরাউনী পরিবারের মেয়ে" করার কোন কারণ দেখি না।

১৩. অর্থাৎ মেয়েটি এমনভাবে ঝুড়ির ওপর নজর রাখে যার ফলে ভাসমান ঝুড়ির সাথে সাথে সে চলতেও থাকে এবং তার প্রতি নজর রাখতেও থাকে। আবার শত্রু যাতে না বুঝতে পারে তার কোন সম্পর্ক ঝুড়ির শিশুটির সাথে আছে সেদিকেও খেয়াল রাখে। ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় হযরত মূসার বোনের বয়স ছিল দশ বারো বছর। সে বড়ই সতর্কতার সাথে ভাইয়ের অনুসরণ করে এবং সে যে ফেরাউনের মহলে পৌঁছে গেছে তা বুঝতে পারে, এ থেকে তার বুদ্ধিমত্তা আন্দাজ করা যায়।

১৪. অর্থাৎ ফেরাউনের স্ত্রী যে ধাত্রীকে স্তন্যদান করার জন্য ডাকতেন শিশু তার স্তনে মুখ লাগাতো না।

১৫. এ থেকে জানা যায়, ভাই ফেরাউনের মহলে পৌঁছে যাবার পর বোন ঘরে বসে থাকেনি। বরং সে একই প্রকার সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে মহলের আশেপাশে চক্কর দিতে থাকে। তারপর যখন জানতে পারে শিশু কারো স্তন মুখে নিচ্ছে না এবং বাদশাহ–বেগম শিশুর পছন্দনীয় ধাত্রীর সন্ধানলাভের জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছে তখন সেই বুদ্ধিমতী মেয়ে সোজা রাজমহলে পৌঁছে যায় এবং ঘটনাস্থলে গিয়ে বলে, আমি একজন ভালো ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি, যে বড়ই স্নেহ ও মমতা সহকারে এ শিশুর লালন পালন করতে পারবে।

এ প্রসংগে একথাও বুঝে নিতে হবে, প্রাচীন কালে বড় ও অভিজাত বংশীয় লোকেরা নিজেদের শিশু সন্তান নিজেদের কাছে লালন পালন করার পরিবর্তে সাধারণত ধাত্রীদের হাতে সোপর্দ করে দিতো এবং তারাই নিজেদের কাছে রেখেই তাদের লালন পালন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন কাহিনীতেও এ কথার উল্লেখ আছে যে, মক্কার আশপাশের মহিলারা মাঝে মাঝে মক্কায় আসতো ধাত্রীর সেবা দান করার জন্য এবং সরদারদের সন্তানদেরকে মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধপান করাবার জন্য নিয়ে যেতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও হালীমা সা'দীয়ার গৃহে মরুভূমির বুকে প্রতিপালিত হয়েছেন। মিসরেও ছিল এই একই রেওয়াজ। এ কারণে হযরত মূসার বোন একথা বলেননি, "আমি একজন ভালো ধাত্রী এনে দিচ্ছি" বরং বলেন, এমন গৃহের সন্ধান দিচ্ছি যার অধিবাসীরা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে এবং তারা কল্যাণকামিতার সাথে একে লালন পালন করবে।"

১৬. বাইবেল ও তালমূদ থেকে জানা যায়, শিশুর মূসা নাম ফেরাউনের গৃহেই রাখা হয়। এটি হিব্রু নয় বরং কিবৃতী ভাষার শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, আমি তাকে পানি থেকে বের করলাম। প্রাচীন মিসরীয় ভাষা থেকেও হযরত মূসার নামের এ অর্থকরণ সঠিক প্রমাণিত হয়। সে ভাষায় 'মু' মানে পানি এবং 'উশা' এর মানে হয় উদ্ধার প্রাপ্ত।

১৭. আর আল্লাহর এ কুশলী ব্যবস্থার ফলে এ লাভটিও হয় যে, হযরত মূসা প্রকৃতপক্ষে ফেরাউনের শাহজাদা হতে পারেননি বরং নিজের মা-বাপ-ভাই-বোনদের মধ্যে প্রতিপালিত হবার কারণে নিজের আসল পরিচয় তিনি ভালোভাবেই অবহিত থাকতে পেরেছেন। নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য ও পিতৃ পুরুষের ধর্ম এবং নিজের জাতি থেকে তাঁর সম্পর্কচ্যুতি ঘটতে পারেনি। তিনি ফেরাউন পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার পরিবর্তে নিজের মানসিক আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে পুরোপুরিভাবে বনী ইসরাঈলেরই একজন সদস্যে পরিণত হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে বলেছেন ঃ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেলো এবং তার বিকাশ পূর্ণতা লাভ করলো[১৮] তখন আমি তাকে হুকুম ও জ্ঞান দান করলাম,[১৯] সৎলোকদেরকে আমি এ ধরনেরই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (একদিন) সে শহরে এমন সময় প্রবেশ করলো যখন শহরবাসীরা উদাসীন ছিল।[২০] সেখানে সে দেখলো দু'জন লোক লড়াই করছে। একজন তার নিজের সম্প্রদায়ের এবং অন্যজন তার শত্রু সম্প্রদায়ের। তার সম্প্রদায়ের লোকটি শত্রু সম্প্রদায়ের লোকটির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য ডাক দিল। মূসা তাকে একটি ঘুঁষি মারলো[২১] এবং তাকে মেরে ফেললো। (এ কাণ্ড ঘটে যেতেই) মূসা বললো, "এটা শয়তানের কাজ, সে ভয়ংকর শত্রু এবং প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী।"[২২]

مثل الذى يعمل ويحتسب فى صنعته الخير كمثل ام موسى ترضع ولدها وتاخذ اجرها -

"যে ব্যক্তি নিজের রুজি রোজগারের জন্য কাজ করে এবং সে কাজে লক্ষ থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তার দৃষ্টান্ত হযরত মূসার মায়ের মতো ঃ তিনি নিজেরই সন্তানকে দুধ পান করান আবার তার বিনিময়ও লাভ করেন।" অর্থাৎ এ ধরনের লোক যদিও নিজের ও নিজের সন্তানদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেয়ার জন্য কাজ করে কিন্তু যেহেতু সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ঈমানদারীর সাথে কাজ করে, যার সাথেই কাজ কারবার করে তার হক যথাযথভাবে আদায় করে এবং হালাল রিজিকের মাধ্যমে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণকে আল্লাহর ইবাদাত মনে করে, তাই নিজের জীবিকা উপার্জনের জন্যও সে আল্লাহর কাছে পুরস্কারলাভের অধিকারী হয়। অর্থাৎ একদিকে জীবিকা ও উপার্জন করা হয় এবং অন্যদিকে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব ও প্রতিদানও লাভ করা হয়।

১৮. অর্থাৎ যখন তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। ইহুদী বিবরণসমূহে এ সময় হযরত মূসার বিভিন্ন বয়সের কথা বলা হয়েছে। কোথাও ১৮, কোথাও ২০ আবার কোথাও ৪০ বছরও বলা হয়েছে। বাইবেলের নূতন নিয়মে ৪০ বছর বলা হয়েছে (প্রেরিতদের কার্য বিবরণ ৭ ঃ ২৩) কিন্তু কুরআন কোন বয়স নির্দেশ করেনি। যে উদ্দেশ্যে কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে সেজন্য কেবলমাত্র এতটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে, সামনের দিকে যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে তা এমন এক সময়ের, যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

১৯. হুক্‌ম অর্থ হিকমত, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা–ধী–শক্তি ও বিচারবুদ্ধি। আর জ্ঞান বলতে বুঝানো হয়েছে দীনী ও দুনিয়াবী উভয় ধরনের তত্ত্বজ্ঞান। কারণ নিজের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক–সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে তিনি নিজের বাপ–দাদা তথা হযরত ইউসুফ, ইয়াকুব ও ইসহাক আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। আবার তদানীন্তন বাদশাহর পরিবারে রাজপুত্র হিসেবে প্রতিপালিত হবার কারণে সমকালীন মিসরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ হুক্‌ম ও জ্ঞানদান অর্থ নবুওয়াত দান নয়। কারণ নবুওয়াত তো হযরত মূসাকে এর কয়েক বছর পরে দান করা হয়। সামনের দিকে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সূরা শু'আরায়ও (২১ আয়াত) এ বর্ণনা এসেছে।

এ রাজপুত্র থাকাকালীন সময়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে বাইবেলের নূতন নিয়মের প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে ঃ "আর মোশি মিস্রীয়দের সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত হইলেন, এবং তিনি বাক্যে ও কার্যে পরাক্রমী ছিলেন।" (৭ঃ২২) তালমূদের বর্ণনা মতে মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের গৃহে একজন সুদর্শন যুবা পুরুষ হিসেবে বড় হয়ে ওঠেন। রাজপুত্রদের মতো পোশাক পরতেন। রাজপুত্রের মতো বসবাস করতেন। লোকেরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। তিনি প্রায়ই জুশান এলাকায় যেতেন। সেখানে ছিল ইসরাঈলীদের বসতি, তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের সাথে কিবতী সরকারের কর্মচারীরা যেসব দুর্ব্যবহার ও বাড়াবাড়ি করতো সেসব নিজের চোখে দেখতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ফেরাউন ইসরাঈলীদের জন্য সপ্তাহে একদিন ছুটির বিধান করে। তিনি ফেরাউনকে বলেন, চিরকাল দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত কাজ করতে থাকলে এরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এর ফলে সরকারেরই কাজের ক্ষতি হবে। এদের শক্তির পুনর্বহালের জন্য সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করা দরকার। এভাবে নিজের বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তিনি এমনি আরো বহু কাজ করেছিলেন যার ফলে সারা মিসর দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। (তালমূদের বিবরণ ১২৯ পৃঃ)

২০. হতে পারে এটা ছিল একেবারে ভোর বেলা অথবা গরমকালের দুপুরের সময় কিংবা শীতকালে রাতের বেলা। মোটকথা, তখন সময়টা এমন ছিল যখন পথঘাট ছিল জন কোলাহল মুক্ত এবং সারা শহর ছিল নীরব নিঝুম।

"শহরে প্রবেশ করলো" এ শব্দগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাজপ্রাসাদ সাধারণ জনবসতি থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। হযরত মূসা যেহেতু রাজপ্রাসাদে থাকতেন তাই শহরে বের হলেন, না বলে বলা হয়েছে, শহরে প্রবেশ করলেন।

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

তারপর সে বলতে লাগলো, "হে আমার রব! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও।"[২৩] তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন তিনি ক্ষমাশীল মেহেরবান।[২৪] মূসা শপথ করলো, "হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি এই যে অনুগ্রহ করেছো[২৫] এরপর আমি আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না"।[২৬]

দ্বিতীয় দিন অতি প্রত্যূষে সে ভয়ে ভয়ে এবং সর্বদিক থেকে বিপদের আশংকা করতে করতে শহরের মধ্যে চলছিল। সহসা দেখলো কি, সেই ব্যক্তি যে গতকাল সাহায্যের জন্য তাকে ডেকেছিল আজ আবার তাকে ডাকছে। মূসা বললো, "তুমি তো দেখছি স্পষ্টতই বিভ্রান্ত।"[২৭]

২১. মূলে وكز শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ চড় মারাও হতে পারে আবার ঘুঁষি মারাও হতে পারে। চড়ের তুলনায় ঘুষির আঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশী। তাই আমি এখানে অনুবাদে ঘুষি শব্দ গ্রহণ করেছি।

২২. এ থেকে অনুমান করা যায়, ঘুষি খেয়ে মিসরীয়টি যখন পড়ে গেলো এবং পড়ে গিয়ে মারা গেলো তখন কী ভীষণ লজ্জা ও শংকার মধ্যে হযরত মূসার মুখ থেকে কথাগুলো বের হয়ে গিয়ে থাকবে। হত্যা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘুঁষি মারাও হয়নি। কেউ এটা আশাও করে না, একটি ঘুষি খেয়েই একজন সুস্থ সবল লোক মারা যাবে। তাই হযরত মূসা বললেন, এটা শয়তানের কোন খারাপ পরিকল্পনা বলে মনে হচ্ছে। সে একটি বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটাবার জন্য আমার হাত দিয়ে একাজ করিয়েছে। ফলে আমার বিরুদ্ধে একজন ইসরাঈলীকে সাহায্য করার জন্য একজন কিবৃতীকে হত্যা করার অভিযোগ আসবে এবং শুধু আমার বিরুদ্ধে নয় বরং সমগ্র ইসরাঈলী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মিসরে একটি বিরাট হাংগামা সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা কুরআন থেকে ভিন্ন। বাইবেল হযরত মূসার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ এনেছে। তার বর্ণনা মতে মিসরীয় ও ইসরাঈলীকে লড়াই করতে দেখে হযরত মূসা "এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিস্রীয়কে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেন।" (যাত্রা পুস্তক ২:১২) তালমূদেও একই কথা বলা হয়েছে। এখন বনী ইসরাঈল কিভাবে নিজেদের মনীষীদের চরিত্রে নিজেরাই কলংক লেপন করেছে

এবং কুরআন কিভাবে তাঁদের ভূমিকা পরিচ্ছন্ন ও কলংকমুক্ত করেছে তা যে কোন ব্যক্তি বিচার করতে পারে। সাধারণ বিবেক বুদ্ধিও এ কথাই বলে, একজন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তি, পরবর্তীকালে যাঁকে হতে হবে একজন মহিমান্বিত পয়গম্বর এবং মানুষকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি মর্যাদাশালী আইন ব্যবস্থা দান করা হবে যাঁর দায়িত্ব, তিনি এমন একজন অন্ধ জাতীয়তাবাদী হতে পারেন না যে, নিজের জাতির একজনকে অন্য জাতির কোন ব্যক্তির সাথে মারামারি করতে দেখে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে স্বেচ্ছায় বিপক্ষীয় ব্যক্তিকে মেরে ফেলবেন। ইসরাঈলীকে মিসরীয়দের কব্জায় দেখে তাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য হত্যা করা যে, বৈধ হতে পারে না, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

২৩. মূল শব্দ হচ্ছে "মাগফিরাত" এর অর্থ ক্ষমা করা ও মাফ করে দেয়াও হয় আবার গোপনীয়তা রক্ষা করাও হয়। হযরত মূসার (আ) দোয়ার অর্থ ছিল, আমার এ গোনাহ (যা তুমি জানো, আমি জেনে–বুঝে করিনি) তুমি মাফ করে দাও এবং এর ওপর আবরণ দিয়ে ঢেকে দাও, যাতে শত্রুরা জানতে না পারে।

২৪. এরও দুই অর্থ এবং দু'টিই এখানে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর এ ত্রুটি মাফ করে দেন এবং হযরত মূসার গোপনীয়তাও রক্ষা করেন। অর্থাৎ কিবৃতী জাতির কোন ব্যক্তি এবং কিবৃতী সরকারের কোন লোকের সে সময় তাদের আশেপাশে বা ধারে কাছে গমনাগমন হয়নি। ফলে তারা কেউ এ হত্যাকাণ্ড দেখেনি। এভাবে হযরত মূসার পক্ষে নির্বিঘ্নে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়ার সুযোগ ঘটে।

২৫. অর্থাৎ আমার কাজটি যে গোপন থাকতে পেরেছে, শত্রু জাতির কোন ব্যক্তি যে আমাকে দেখতে পায়নি এবং আমার সরে যাওয়ার যে সুযোগ ঘটেছে, এই অনুগ্রহ।

২৬. হযরত মুসার এ অংগীকার অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলীর মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। এর অর্থ কেবল এই নয় যে, আমি কোন অপরাধীর সহায়ক হবো না বরং এর অর্থ এটাও হয় যে, আমার সাহায্য–সহায়তা কখনো এমন লোকদের পক্ষে থাকবে না যারা দুনিয়ায় জুলুম ও নিপীড়ন চালায়। ইবনে জারীর এবং অন্য কয়েকজন তাফসীরকার এভাবে এর একেবারে সঠিক অর্থ নিয়েছেন যে, সেই দিনই হযরত মূসা ফেরাউন ও তার সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অংগীকার করেন। কারণ ফেরাউনের সরকার ছিল একটি জালেম সরকার এবং সে আল্লাহর এ সরযমীনে একটি অপরাধমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। তিনি অনুভব করেন, কোন ঈমানদার ব্যক্তি একটি জালেম সরকারের হাতিয়ারে পরিণত হতে এবং তার শক্তি ও পরাক্রম বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করতে পারে না।

মুসলিম আলেমগণ সাধারণভাবে হযরত মূসার এ অংগীকার থেকে একথা প্রমাণ করেছেন যে, একজন মু'মিনের কোন জালেমকে সাহায্য করা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা উচিত। সে জালেম কোন ব্যক্তি, দল, সরকার বা রাষ্ট্র যেই হোক না কেন। প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহর কাছে এক ব্যক্তি বলে, আমার ভাই বনী উমাইয়া সরকারের অধীনে কূফার গভর্ণরের কাতিব (সচিব), বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করা তার কাজ নয়, তবে যেসব ফায়সালা করা হয় সেগুলো তার কলমের সাহায্যেই জারী হয়। এ চাকরী না করলে সে ভাতে মারা যাবে। হযরত আতা জবাবে এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, তোমার ভাইয়ের নিজের কলম ছুঁড়ে ফেলে দেয়া উচিত, রিযিকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ।

فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ز قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ز قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾

তারপর মূসা যখন শত্রু সম্প্রদায়ের লোকটিকে আক্রমণ করতে চাইলো[২৮] তখন সে চিৎকার করে উঠলো,[২৯] "হে মূসা! তুমি কি আজকে আমাকে ঠিক তেমনিভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছো যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো দেখছি এদেশে স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকতে চাও, সংস্কারক হতে চাও না? এরপর এক ব্যক্তি নগরীর দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এলো[৩০] এবং বললো, "হে মূসা! সরদারদের মধ্যে তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ চলছে। এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার মঙ্গলাকাংখী।" এ খবর শুনতেই মূসা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং সে দোয়া করলো, "হে আমার রব! আমাকে জালেমদের হাত থেকে বাঁচাও।"

আর একজন কাতিব 'আমের শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আবু 'আমর! আমি শুধুমাত্র হুকুমনামা লিখে তা জারী করার দায়িত্ব পালন করি মূল ফায়সালা করার দায়িত্ব আমার নয়। এ জীবিকা কি আমার জন্য বৈধ?" তিনি জবাব দেন, "হতে পারে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার ফায়সালা করা হয়েছে এবং তোমার কলম দিয়ে তা জারী হবে। হতে পারে, কোন সম্পদ নাহক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অথবা কারো গৃহ ধসানোর হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তা তোমার কলম দিয়ে জারী হচ্ছে"। তারপর ইমাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। আয়াতটি শুনেই কাতিব বলে ওঠেন, "আজকের পর থেকে আমার কলম বনী উমাইয়ার হুকুমনামা জারী হবার কাজে ব্যবহৃত হবে না।" ইমাম বললেন, "তাহলে আল্লাহও তোমাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

আবদুর রহমান ইবনে মুসলিম যাহ্‌হাককে শুধুমাত্র বুখারায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বেতন বন্টন করে দেবার কাজে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

৩ রুকূ'

(মিসর থেকে বের হয়ে) যখন মূসা মাদ্‌য়ানের দিকে রওয়ানা হলো[৩১] তখন সে বললো, "আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথে চালিত করবেন।"[৩২] আর যখন সে মাদ্‌য়ানের কুয়ার কাছে পৌছুল,[৩৩] সে দেখলো, অনেক লোক তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে দু'টি মেয়ে নিজেদের পশুগুলো আগলে রাখছে। মূসা মেয়ে দু'টিকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের সমস্যা কি?" তারা বললো, "আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না এ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়, আর আমাদের পিতা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি।"[৩৪]

করতেও অস্বীকার করেন। তাঁর বন্ধুরা বলেন, এতে ক্ষতি কি? তিনি বলেন, আমি জালেমদের কোন কাজেও সাহায্যকারী হতে চাই না। (রুহুল মা'আনী ৩ খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানীফার একটি ঘটনা তাঁর নির্ভরযোগ্য জীবনীকারগণ আল মুওয়াফ্‌ফাক আল মক্কী, ইবনুল বায্‌যার আল কারওয়ারী, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ সবাই তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে, তারই পরামর্শক্রমে বাদশাহ মনসূরের প্রধান সেনাপতি হাসান ইবনে কাহ্‌তুবাহ একথা বলে নিজের পদ থেকে ইস্তেফা দেন যে, আজ পর্যন্ত আমি আপনার রাষ্ট্রের সমর্থনে যা কিছু করেছি এ যদি আল্লাহর পথে হয়ে থাকে তাহলে এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু এ যদি জুলুমের পথে হয়ে থাকে তাহলে আমার আমল নামায় আমি আর কোন অপরাধের সংখ্যা বাড়াতে চাই না।

২৭. অর্থাৎ তুমি ঝগড়াটে স্বভাবের বলে মনে হচ্ছে। প্রতিদিন কারো না কারো সাথে তোমার ঝগড়া হতেই থাকে। গতকাল একজনের সাথে ঝগড়া বাধিয়েছিলে, আজ আবার আর একজনের সাথে বাধিয়েছো।

২৮. বাইবেলের বর্ণনা এখানে কুরআন থেকে আলাদা। বাইবেল বলে, দ্বিতীয় দিনের ঝগড়া ছিল দু'জন ইসরাঈলীর মধ্যে। কিন্তু কুরআন বলছে, এ ঝগড়াও ইসরাঈলী ও মিসরীয়ের মধ্যে ছিল। এ দ্বিতীয় বর্ণনাটিই যুক্তি সংগত বলে মনে হয়। কারণ প্রথম দিনের হত্যা রহস্য প্রকাশ হবার যে কথা সামনের দিকে আসছে মিসরীয় জাতির একজন লোক

সে ঘটনা জানতে পারলেই তা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতো। একজন ইসরাঈলী তা জানতে পারলে সে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের জাতির পালক-রাজপুত্রের এত বড় অপরাধের খবর ফেরাউনী সরকারের গোচরীভূত করবে এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

২৯. যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করার জন্য হযরত মূসা এগিয়ে গিয়েছিলেন, এ ছিল তারই চিৎকার। তাকে ধমক দেবার পর যখন তিনি মিসরীয়টিকে মারতে উদ্যত হলেন তখন ইসরাঈলীটি মনে করলো হযরত মূসা বুঝি তাকে মারতে আসছেন। তাই সে চিৎকার করতে থাকলো এবং নিজের বোকামির জন্য গতকালের হত্যা রহস্যও প্রকাশ করে দিল।

৩০. অর্থাৎ এ দ্বিতীয় ঝগড়ার ফলে হত্যা রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট মিসরীয়টি যখন গিয়ে সরকারকে জানিয়ে দিল তখন এ পরামর্শের ঘটনা ঘটে।

৩১. হযরত মূসার মিসর থেকে বের হয়ে মাদ্‌য়ানের দিকে যাবার ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা কুরআনের সাথে মিলে যায়। কিন্তু তালমূদ এ প্রসংগে এক ভিত্তিহীন কাহিনী বর্ণনা করেছে। সেটি এই যে, হযরত মূসা মিসর থেকে হাবৃশায় পালিয়ে যান এবং সেখানে গিয়ে বাদশাহর পারিষদে পরিণত হন। তারপর বাদশাহর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকেই নিজেদের বাদশাহের সিংহাসনে বসায় এবং বাদশাহর বিধবা স্ত্রীর সাথে তাঁর বিয়ে দেন। ৪০ বছর তিনি সেখানে রাজত্ব করেন। কিন্তু এ সুদীর্ঘ সময়কালে তিনি কখনো নিজের হাবশী স্ত্রীর নিকটবর্তী হননি। ৪০ বছর অতিক্রান্ত হবার পর ঐ ভদ্র মহিলা হাবশার জনগণের কাছে এ মর্মে অভিযোগ করে যে, চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত এ ব্যক্তি আমার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করেনি এবং কখনো হাবশার দেবতাদের পূজা করেনি। এ কথায় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাঁকে পদচ্যুত করে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ দিয়ে সসম্মানে বিদায় করে দেয়। তখন তিনি হাবশা ত্যাগ করে মাদ্‌য়ানে পৌছে যান এবং সেখানে সামনে যেসব ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেগুলো ঘটে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর।

এ কাহিনীটি যে ভিত্তিহীন এর একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসময় আসিরীয়ায় (উত্তর ইরাক) হাবশার শাসন চলছিল এবং আসিরীয়বাসীদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য হযরত মূসা ও তাঁর পূর্ববর্তী বাদশাহরাও সামরিক অভিযান চালান। সামান্যতম ইতিহাস-ভূগোল জ্ঞান যার আছে সে পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে একটু নজর দিলেই দেখতে পাবে যে, আসিরীয়ার ওপর হাবশার শাসন বা হাবশী সেনাদলের আক্রমণের ব্যাপারটি কেবলমাত্র তখনই ঘটতে পারতো যখন মিসর, ফিলিস্তীন ও সিরিয়া তার দখলে থাকতো অথবা সমগ্র আরব দেশ তার কর্তৃত্বাধীন হতো কিংবা হাবশার নৌবাহিনী এতই শক্তিশালী হতো যে, তা ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগর অতিক্রম করে ইরাক দখল করতে সক্ষম হতো। এদেশগুলোয় কখনো হাবশীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অথবা তাদের নৌশক্তি কখনো এত বিপুল শক্তির অধিকারী ছিল এ ধরনের কোন কথা ইতিহাসে নেই। এ থেকে বুঝা যায় যে, নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের জ্ঞান কতটা অপরিপক্ক ছিল এবং কুরআন তাদের ভুলগুলো সংশোধন করে কেমন সুস্পষ্ট আকারে সঠিক ঘটনাবলী পেশ করছে। কিন্তু

ইহুদী ও খৃষ্টান প্রাচ্যবিদগণ একথা বলতে লজ্জা অনুভব করেন না যে, কুরআন এসব কাহিনী বনী ইসরাঈল থেকে সংগ্রহ করেছে।

৩২. অর্থাৎ এমন পথ যার সাহায্যে সহজে মাদ্‌য়ানে পৌঁছে যাবো।

উল্লেখ্য, সে সময় মাদ্‌য়ান ছিল ফেরাউনের রাজ্য–সীমার বাইরে। সমগ্র সিনাই উপদ্বীপে মিসরের কর্তৃত্ব ছিল না। বরং তার কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ এলাকা পর্যন্ত। আকাবা উপসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম তীরে ছিল বনী মাদ্‌য়ানের বসতি এবং এ এলাকা ছিল মিসরীয় প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এ কারণে হযরত মূসা মিসর থেকে বের হয়েই মাদ্‌য়ানের পথ ধরেছিলেন। কারণ এটাই ছিল নিকটতম জনবসতিপূর্ণ স্বাধীন এলাকা। কিন্তু সেখানে যেতে হলে তাঁকে অবশ্যই মিসর অধিকৃত এলাকা দিয়েই এবং মিসরীয় পুলিশ ও সেনা–চৌকিগুলোর নজর এড়িয়ে যেতে হতো। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আমাকে এমন পথে নিয়ে যাও যেপথ দিয়ে আমি সহি–সালামতে মাদ্‌য়ান পৌঁছে যেতে পারি।

৩৩. এ স্থানটি, যেখানে হযরত মূসা পৌঁছেছিলেন, এটি ছিল আরবীয় বর্ণনা অনুযায়ী আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীরে মানকা থেকে কয়েক মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্তমানে এ জায়গাটিকে আল বিদ্‌'আ বলা হয়। সেখানে একটি ছোট মতো শহর গড়ে উঠেছে। আমি ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাবুক থেকে আকাবায় যাওয়ার পথে এ জায়গাটি দেখেছি। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে জানিয়েছে, বাপ–দাদাদের আমল থেকে আমরা শুনে আসছি মাদ্‌য়ান এখানেই অবস্থিত ছিল। ইউসিফুস থেকে নিয়ে বার্টন পর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদগণও সাধারণভাবে এ স্থানটিকেই মাদ্‌য়ান বলে চিহ্নিত করেছেন। এর সন্নিকটে সামান্য দূরে একটি স্থানকে বর্তমানে "মাগায়েরে শু'আইব" বা "মাগারাতে শু'আইব" বলা হয়। সেখানে সামূদী প্যাটার্নের কিছু ইমারত রয়েছে। আর এর প্রায় এক মাইল দু' মাইল দূরে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর মধ্যে আমরা দেখেছি দু'টি অন্ধকূপ। স্থানীয় লোকেরা আমাদের জানিয়েছে, নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারি না, তবে আমাদের এখানে একথাই প্রচলিত যে, এদু'টি কূয়ার মধ্য থেকে একটি কূয়ায় হযরত মূসা তাঁর ছাগলদের পানি পান করিয়েছেন। একথাটিই আবুল ফিদা (মৃত্যু ৭৩২ হিঃ) তাকবীমুল বুলদানে এবং ইয়াকুত মু'জামুল বুলদানে আবু যায়েদ আনসারীর (মৃত্যু ২১৬ হিঃ) বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ এলাকার অধিবাসীরা এ স্থানেই হযরত মূসার ঐ কূয়াটি চিহ্নিত করে থাকে। এ থেকে জানা যায়, এ বর্ণনাটি শত শত বছর থেকে সেখানকার লোকদের মুখে মুখে বংশানুক্রমে চলে আসছে এবং এরি ভিত্তিতে দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে, কুরআন মজীদে যে স্থানটির কথা বলা হয়েছে এটা সেই স্থান। পাশের পাতায় এ স্থানটির কিছু ছবি দেখতে পাবেন।

৩৪. অর্থাৎ আমরা মেয়েমানুষ। এ রাখালদের সাথে টক্কর দিয়ে ও সংঘর্ষ বাধিয়ে নিজেদের জানোয়ারগুলোকে আগে পানি পান করাবার সামর্থ আমাদের নেই। অন্যদিকে আমাদের পিতাও এত বেশী বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তিনি নিজে আর কষ্টের কাজ করতে পারেন না। আমাদের পরিবারে আর দ্বিতীয় কোন পুরুষ নেই। তাই আমরা মেয়েরাই এ কাজ করতে বের হয়েছি। সব রাখালদের তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। মেয়ে দু'টি শুধুমাত্র
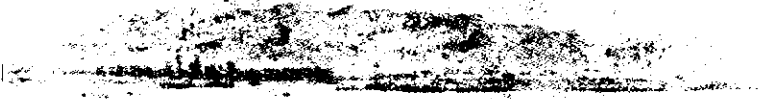
মাদয়ান উপত্যকা

একটি কূপ। কথিত আছে যে, মূসা (আ) এ কূপে ছাগলকে পানি পান করান

একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে এ সমস্ত বক্তব্য উপস্থাপন করে। এ থেকে একদিকে তাদের লজ্জাশীলতার প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ একজন পর পুরুষের সাথে তারা বেশী কথা বলতেও চাচ্ছিল না। আবার এটাও পছন্দ করছিল না যে, এ ভিন দেশী অপরিচিত লোকটি তাদের ঘরানা সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ করুক এবং মনে মনে ভাবুক যে, এরা কেমন লোক যাদের পুরুষরা ঘরে বসে রয়েছে আর ঘরের মেয়েদেরকে একাজ করার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এ মেয়েদের বাপের ব্যাপারে আমাদের এখানে একথা প্রচার হয়ে গেছে যে, তিনি ছিলেন হযরত শু'আইব আলাইহিস সালাম। কিন্তু কুরআন মজীদে ইশারা ইংগিতে কোথাও এমন কথা বলা হয়নি যা থেকে বুঝা যেতে পারে তিনি শু'আইব আলাইহিস সালাম ছিলেন। আথচ শু'আইব আলাইহিস সালাম কুরআনের একটি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। এ মেয়েদের পিতা যদি তিনিই হতেন তাহলে এখানে একথা সুস্পষ্ট না করে দেয়ার কোন কারণই ছিল না। নিসন্দেহে কোন কোন হাদীসে তাঁর নাম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর উভয়ে এ ব্যাপারে একমত যে, এগুলোর কোনটিরও সনদ তথা বর্ণনা সূত্র নির্ভুল নয়। তাই ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, আবু উবাইদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবাইরের ন্যায় বড় বড় তাফসীরকার বনী ইসরাঈলের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তালমূদ ইত্যাদি গ্রন্থে এ মনীষীর যে নাম উল্লেখিত হয়েছে সেটিই বলেছেন। অন্যথায় বলা নিষ্প্রয়োজন, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত শু'আইবের নাম স্পষ্ট করে বলা হতো তাহলে তাঁরা কখনো অন্য নাম উল্লেখ করতেন না।

বাইবেলের এক জায়গায় এ মণীষীর নাম বলা হয়েছে রূয়েল এবং অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যিথ্রো। এবং বলা হয়েছে তিনি মাদ্য়ানের যাজক ছিলেন। (যাত্রা পুস্তক ২ ঃ ১৬–১৮, ৩ ঃ ১ এবং ১৮ ঃ ৫) তালমূদীয় সাহিত্যে রূয়েল, যিথ্রো ও হুবাব তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম বলা হয়েছে। আধুনিক ইহুদী আলেমগণের মতে যিথ্রো ছিল 'হিজ এক্সেলেন্সী' এর সমার্থক একটি উপাধী এবং আসল নাম ছিল রূয়েল বা হুবাব। অনুরূপভাবে কাহেন বা যাজক (Kohen Midian) শব্দটির ব্যাখ্যার ব্যাপারেও ইহুদী আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে পুরোহিত (Priest) এর সমার্থক হিসেবে নিয়েছেন আবার কেউ কেউ রইস বা আমীর (Prince) অর্থে নিয়েছেন।

তালমূদে তাঁর যে জীবনবৃতান্ত বর্ণনা করা হয়েছে তাহচ্ছে এই যে, হযরত মূসার জন্মের পূর্বে ফেরাউনের কাছে তাঁর যাওয়া–আসা ছিল। ফেরাউন তাঁর জ্ঞানও বিচক্ষণতার প্রতি আস্থা রাখতো। কিন্তু যখন বনী ইসরাঈলের ওপর জুলুম–শোষণ চালাবার জন্য মিসরের রাজ পরিষদে পরামর্শ হতে লাগলো এবং তাদের সন্তানদের জন্মের পরপরই হত্যা করার সিদ্ধান্ত হলো তখন তিনি ফেরাউনকে এ অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য বহু প্রচেষ্টা চালালেন। তাকে এ জুলুমের অশুভ পরিণামের ভয় দেখালেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, এদের অস্তিত্ব যদি আপনার কাছে এতই অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে এদেরকে মিসর থেকে বের করে এদের পিতৃ পুরুষের দেশ কেনানের দিকে পাঠিয়ে দিন। তাঁর এ ভূমিকায় ফেরাউন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অপদস্থ করে নিজের দরবার থেকে বের করে দিয়েছিল। সে সময় থেকে তিনি নিজের দেশ মাদ্য়ানে চলে এসে সেখানেই অবস্থান করছিলেন।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿۲۴﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵﴾

একথা শুনে মূসা তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল। তারপর সে একটি ছায়ায় গিয়ে বসলো এবং বললো, "হে আমার প্রতিপালক! যে কল্যাণই তুমি আমার প্রতি নাযিল করবে আমি তার মুখাপেক্ষী।" (বেশিক্ষণ অতিবাহিত হয়নি এমন সময়) ঐ দু'টি মেয়ের মধ্য থেকে একজন লজ্জাজড়িত পদ বিক্ষেপে তার কাছে এলো[৩৫] এবং বলতে লাগলো, "আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের জানোয়ারগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন আপনাকে তার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য।"[৩৬] মূসা যখন তার কাছে পৌঁছুল এবং নিজের সমস্ত কাহিনী তাকে শুনালো তখন সে বললো, "ভয় করো না, এখন তুমি জালেমদের হাত থেকে বেঁচে গেছো।"

তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অনুমান করা হয়, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মতো তিনিও ইবরাহীমী দীনের অনুসারী ছিলেন। কেননা, যেভাবে হযরত মূসা ছিলেন ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের (আলাইহিমাস সালাম) আউলাদ ঠিক তেমনি তিনিও ছিলেন মাদ্‌য়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশধর। এ সম্পর্কের কারণেই সম্ভবত তিনি ফেরাউনকে বনী ইসরাঈলের ওপর জুলুম–নির্যাতন–নিপীড়ন করতে নিষেধ করেন এবং তার বিরাগভাজন হন। কুরআন ব্যাখ্যাতা নিশাপুরী হযরত হাসান বাসরীর বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ

اِنَّهٗ كَانَ رَجُلًا مُّسْلِمًا قَبِلَ الدِّيْنَ مِنْ شُعَيْبٍ

"তিনি একজন মুসলমান ছিলেন। হযরত শু'আইবের দীন তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।"

তালমূদে বলা হয়েছে, তিনি মাদ্‌য়ানবাসীদের মূর্তি পূজাকে প্রকাশ্যে নির্বুদ্ধিতা বলে সমালোচনা করতেন। তাই মাদ্‌য়ানবাসীরা তাঁর বিরোধী হয়ে গিয়েছিল।

৩৫. হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বাক্যাংশটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

جائت تمشى على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة –

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ز اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

মেয়ে দু'জনের একজন তার পিতাকে বললো, "আব্বাজান! একে চাকরিতে নিয়োগ করো, কর্মচারী হিসেবে এমন ব্যক্তিই উত্তম হতে পারে যে বলশালী ও আমানতদার।"[৩৭] তার পিতা (মূসাকে) বললো,[৩৮] "আমি আমার এ দু'মেয়ের মধ্য থেকে একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। শর্ত হচ্ছে, তোমাকে আট বছর আমার এখানে চাকরি করতে হবে। আর যদি দশ বছর পুরো করে দাও, তাহলে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার ওপর কড়াকড়ি করতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎলোক হিসেবেই পাবে। মূসা জবাব দিল, "আমার ও আপনার মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হয়ে গেলো, এ দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেটাই আমি পূরণ করে দেবো তারপর আমার ওপর যেন কোন চাপ দেয়া না হয়। আর যা কিছু দাবী ও অঙ্গীকার আমরা করছি আল্লাহ তার তত্বাবধায়ক।"[৩৯]

"সে নিজের মুখ ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে লজ্জাজড়িত পায়ে হেঁটে এলো। সেই সব ধিংগি চপলা মেয়েদের মতো হন হন করে ছুটে আসেনি, যারা যেদিকে ইচ্ছা যায় এবং যেখানে খুশী ঢুকে পড়ে।"

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত কয়েকটি রেওয়ায়াত সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনুল মুনযির নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত উমর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বদৌলতে এ মনীষীগণ লজ্জাশীলতার ইসলামী ধারণা লাভ করেছিলেন তা অপরিচিত ও ভিন্ পুরুষদের সামনে চেহারা খুলে রেখে ঘোরাফেরা করা এবং বেপরোয়াভাবে ঘরের বাইরে চলাফেরা করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। হযরত উমর (রা) পরিষ্কার ভাষায় এখানে চেহারা ঢেকে রাখাকে লজ্জাশীলতার চিহ্ন এবং তা ভিন পুরুষের সামনে উন্মুক্ত রাখাকে নির্লজ্জতা গণ্য করেছেন।

৩৬. একথাও সে বলে লজ্জা–শরমের কারণে। কেননা, নির্জনে একজন ভিন পুরুষের কাছে একাকী আসার কোন কারণ বলা জরুরী ছিল। অন্যথায় একথা সুস্পষ্ট, একজন ভদ্রলোক যদি কোন মেয়ে মানুষকে পেরেশান দেখে তাকে কোন সাহায্য করে থাকে, তাহলে তার প্রতিদান দেবার কথা বলা কোন ভালো কথা ছিল না। তারপর এ প্রতিদানের নাম শোনা সত্ত্বেও হযরত মূসার মতো একজন মহানুভব ব্যক্তির উঠে এগিয়ে যাওয়া একথা প্রমাণ করে যে, তিনি সে সময় চরম দুরবস্থায় পতিত ছিলেন। একেবারে খালি হাতে অকস্মাত মিসর থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। মাদ্‌য়ান পর্যন্ত পৌঁছতে কমপক্ষে আটদিন লাগার কথা। ক্ষুধা, পিপাসা এবং সফরের ক্লান্তিতে অবস্থা কাহিল না হয়ে পারে না। বিদেশে–পরবাসে কোন থাকার জায়গা পাওয়া যায় কিনা এবং এমন কোন সমব্যথী পাওয়া যায় কিনা যার কাছে আশ্রয় নেয়া যেতে পারে, এ চিন্তা সম্ভবত তাকে সবচেয়ে বেশী পেরেশান করে দিয়েছিল। এ অক্ষমতার কারণেই এত সামান্য সেবা কর্মের পারিশ্রমিক দেবার জন্য ডাকা হচ্ছে শুনে হযরত মূসা যাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করেননি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, আল্লাহর কাছে এখনই আমি যে দোয়া করেছি তা কবুল করার এ ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে, তাই এখন অনর্থক আত্মমর্যাদার ভান করে আল্লাহর দেয়া আতিথ্যের আহবান প্রত্যাখ্যান করা সংগত নয়।

৩৭. হযরত মূসার সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় মেয়েটি তার বাপকে একথা বলেছিল কিনা এটা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে বেশির ভাগ সম্ভাবনা এটাই যে, তার বাপ অপরিচিত মুসাফিরকে দু–একদিন নিজের কাছে রেখে থাকবেন এবং এ সময়ের মধ্যে কখনো মেয়ে তার বাপকে এ পরামর্শ দিয়ে থাকবে। এ পরামর্শের অর্থ ছিল, আপনার বার্ধক্যের কারণে বাধ্য হয়ে আমাদের মেয়েদের বিভিন্ন কাজে বাইরে বের হতে হয়। বাইরের কাজ করার জন্য আমাদের কোন ভাই নেই। আপনি এ ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন। সুঠাম দেহের অধিকারী বলশালী লোক। সবরকমের পরিশ্রমের কাজ করতে পারবে। আবার নির্ভরযোগ্যও। নিছক নিজের ভদ্রতা ও আভিজাত্যের কারণে সে আমাদের মতো মেয়েদেরকে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাদের সাহায্য করেছে এবং আমাদের দিকে কখনো চোখ তুলে তাকায়ওনি।

৩৮. একথাও জরুরী নয় যে, মেয়ের কথা শুনেই বাপ সংগে সংগেই হযরত মূসাকে একথা বলে থাকবেন। সম্ভবত তিনি মেয়ের পরামর্শ সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করার পর এই মত স্থির করেছিলেন যে, লোকটি ভদ্র ও অভিজাত, একথা ঠিক। কিন্তু ঘরে যেখানে জোয়ান মেয়ে রয়েছে সেখানে একজন জোয়ান, সুস্থ, সবল লোককে এমনি কর্মচারী হিসেবে রাখা ঠিক নয়। এ ব্যক্তি যখন ভদ্র, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও অভিজাত বংশীয় (যেমন হযরত মূসার মুখে তাঁর কাহিনী শুনে তিনি মনে করে থাকবেন) তখন একে জামাতা করেই ঘরে রাখা হোক। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কোন উপযুক্ত সময়ে তিনি হযরত মূসাকে একথা বলে থাকবেন।

এখানে দেখুন বনী ইসরাঈলের আর একটি কীর্তি। তারা তাদের মহান মর্যাদাসম্পন্ন নবী এবং নিজেদের সবচেয়ে বড় হিতকারী ও জাতীয় হিরোর কী দুর্গতি করেছে! তালমুদে বলা হয়েছে, “মূসা রুয়েলের বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি নিজের মেজবানের মেয়ে সাফুরার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে বিয়ে করলেন।” আর একটি ইহুদী বর্ণনা জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়ায় উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে

বলা হয়েছে, "হযরত মূসা যখন যিথ্রোকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন এ ব্যক্তির হাতেই ফেরাউনের রাজ্য ধ্বংস হবার ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল। তাই তিনি সংগে সংগেই হযরত মূসাকে বন্দী করে ফেললেন, যাতে তাঁকে ফেরাউনের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে পুরস্কার লাভ করতে পারেন। সাত বা দশ বছর পর্যন্ত তিনি তার বন্দীশালায় থাকলেন। ভূ-গর্ভস্থ একটি অন্ধকার কুঠরিতে তিনি বন্দী ছিলেন। কিন্তু যিথ্রোর মেয়ে যাফূরা (বা সাফূরা), যার সাথে কূয়ার পাড়ে তাঁর প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল, চুপি চুপি তাঁর সাথে কারাগৃহে সাক্ষাত করতে থাকে। সে তাকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতো। তাদের দু'জনের মধ্যে বিয়ের গোপন চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। সাত বা দশ বছর পরে যাফূরা তার বাপকে বললো, এত দীর্ঘকাল হয়ে গেলো আপনি এক ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তারপর তার কোন খবরও নেননি। এতদিন তার মরে যাওয়ারই কথা। কিন্তু যদি জীবিত থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে কোন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি। যিথ্রো তার একথা শুনে কারাগারে গেলেন। সেখানে হযরত মূসাকে জীবিত থাকতে দেখে তার মনে বিশ্বাস জন্মালো অলৌকিকতার মাধ্যমে এ ব্যক্তি জীবিত আছে। তখন তিনি যাফূরার সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন।"

যেসব পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ কুরআনী কাহিনীগুলোর উৎস খুঁজে বেড়ান, কুরআনী বর্ণনা ও ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্যে এই যে সুস্পষ্ট পার্থক্য এখানে দেখা যাচ্ছে তা কি কখনো তাদের চোখে পড়ে?

৩৯. কেউ কেউ হযরত মূসার সাথে মেয়ের বাপের এ কথাবার্তাকে বিয়ের ইজাব কবুল মনে করে নিয়েছেন। এ প্রসংগে তাঁরা এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, বাপের সেবা মেয়ের বিয়ের মোহরানা হিসেবে গণ্য হতে পারে কিনা? এবং বিয়ে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাইরের শর্ত শামিল হতে পারে কি? অথচ আলোচ্য আয়াতের ভাষ্য থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল না। বরং এটি ছিল প্রাথমিক কথাবার্তা, বিয়ের পূর্বে বিয়ের প্রস্তাব আসার পর সাধারণভাবে দুনিয়ায় যে ধরনের কথাবার্তা হয়ে থাকে। এটা কেমন করে বিয়ের ইজাব কবুল হতে পারে যখন একথাই স্থিরীকৃত হয়নি দু'টি মেয়ের মধ্য থেকে কোন্‌টির সাথে বিয়ে দেয়া হচ্ছে? কথাবার্তা শুধু এতটুকু হয়েছিল যে ঃ "আমার মেয়েদের মধ্য থেকে একটির সাথে আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই। তবে শর্ত হচ্ছে, তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, আট দশ বছর আমার এখানে থেকে আমার কাজে সাহায্য করতে হবে। কারণ এ আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে আমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি বৃদ্ধ লোক কোন ছেলে সন্তান আমার নেই, যে আমার সম্পত্তি দেখাশুনা ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে। আমার আছে মেয়ে। বাধ্য হয়ে তাদেরকে আমি বাইরে পাঠাই। আমি চাই আমার জামাতা আমার দক্ষিণ হস্ত হয়ে থাকবে। এ দায়িত্ব যদি তুমি পালন করতে পারো এবং বিয়ের পরেই স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকে তাহলে আমার মেয়ের বিয়ে আমি তোমার সাথে দেবো। হযরত মূসা নিজেই এসময় একটি আশ্রয়ের সন্ধানে ছিলেন। তিনি এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, বিয়ের পূর্বে বর পক্ষ ও কণে পক্ষের মধ্যে যেসব চুক্তি হয়ে থাকে এটি ছিল সে ধরনের একটি চুক্তি। এরপর যথারীতি আসল বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে এবং তাতে মোহরানাও নির্ধারিত হয়ে থাকবে। সে বিয়েতে সেবা কর্মের কোন শর্ত শামিল হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৪ রুকূ'

মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করে দিল।[৪০] এবং নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে চললো তখন তূর পাহাড়ের দিক থেকে একটি আগুন দেখতে পেলো।[৪১] সে তার পরিবারবর্গকে বললো, "থামো, আমি একটি আগুন দেখেছি, হয়তো আমি সেখান থেকে কোন খবর আনতে পারি অথবা সেই আগুন থেকে কোন অংগারই নিয়ে আসতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।" সেখানে পৌঁছার পর উপত্যকার ডান কিনারায় [৪২] পবিত্র ভূখণ্ডে [৪৩] একটি বৃক্ষ থেকে আহবান এলো, "হে মূসা! আমিই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের অধিপতি।"

৪০. হযরত হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, হযরত মূসা (আ) আট বছরের জায়গায় দশ বছরের মেয়াদ পুরা করেছিলেন। ইবনে আববাসের বর্ণনা মতে এ বক্তব্যটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, قضى موسى اتم الاجلين واطيبهما عشرسنين অর্থাৎ "মূসা আলাইহিস সালাম দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেটি বেশী পরিপূর্ণ এবং তাঁর শ্বশুরের জন্য বেশী সন্তোষজনক সেটি পূর্ণ করেছিলেন অর্থাৎ দশ বছর।"

৪১. এ সফরে হযরত মূসার তূর পাহাড়ের দিকে যাওয়া দেখে অনুমান করা যায় তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে সম্ভবত মিসরের দিকে যেতে চাচ্ছিলেন। কারণ মাদ্‌য়ান থেকে মিসরের দিকে যে পথটি গেছে তূর পাহাড় তার ওপর অবস্থিত। সম্ভবত হযরত মূসা মনে করে থাকবেন, দশটি বছর চলে গেছে, যে ফেরাউনের শাসনামলে তিনি মিসর থেকে বের হয়েছিলেন সে মারা গেছে, এখন যদি আমি নীরবে সেখানে চলে যাই এবং নিজের পরিবারের লোকজনদের সাথে অবস্থান করতে থাকি তাহলে হয়তো আমার কথা কেউ জানতেই পারবে না।

ঘটনা বিন্যাসের দিক দিয়ে বাইবেলের বর্ণনা এখানে কুরআন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাইবেল বলে, হযরত মূসা তাঁর শ্বশুরের ছাগল চরাতে চরাতে "প্রান্তরের পশ্চাদভাগে

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۝ اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

আর (হুকুম দেয়া হলো) ছুঁড়ে দাও তোমার লাঠিটি। যখনই মূসা দেখলো লাঠিটি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই সে পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং একবার ফিরেও তাকালো না। বলা হলো, "হে মূসা! ফিরে এসো এবং ভয় করো না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার হাত বগলে রাখো উজ্জল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই।[৪৪] এবং ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দু'টি চেপে ধরো।[৪৫] এ দু'টি উজ্জল নিদর্শন তোমার রবের পক্ষ থেকে ফেরাউন ও তার সভাসদদের সামনে পেশ করার জন্য, তারা বড়ই নাফরমান।"[৪৬]

মেষপাল লইয়া গিয়া হোরেবে ঈশ্বরের পর্বতে" চলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিজের শ্বশুরের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের সন্তান সন্ততি সহকারে মিসরের পথে যাত্রা করেছিলেন। (যাত্রা পুস্তক ৩ ঃ ১ এবং ৪ ঃ ১৮) অপর দিকে কুরআন বলে, হযরত মূসা মেয়াদ পুরা করার পর নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে মাদ্‌য়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং এ সফরে আল্লাহর সাথে কথাবার্তা এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

বাইবেল ও তালমূদের সম্মিলিত বর্ণনা হচ্ছে, যে ফেরাউনের পরিবারে হযরত মূসা প্রতিপালিত হয়েছিলেন তাঁর মাদ্‌য়ানে অবস্থানকালে সে মারা গিয়েছিল এবং তারপর অন্য একজন ফেরাউন ছিল মিসরের শাসক।

৪২. অর্থাৎ হযরত মূসার ডান হাতের দিকে যে কিনারা ছিল সেই কিনারায়।

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর দ্যুতির আলোকে যে ভূখণ্ড আলোকিত হচ্ছিল।

৪৪. এ মু'জিযা দু'টি তখন হযরত মূসাকে দেখানোর কারণ হচ্ছে, প্রথমত যাতে তার মনে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, প্রকৃতপক্ষে যে সত্তা বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থার স্রষ্টা, অধিপতি, শাসক ও পরিচালক তিনিই তাঁর সাথে কথা বলছেন। দ্বিতীয়ত এ মু'জিযাগুলো দেখে তিনি এ মর্মে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন যে, তাঁকে ফেরাউনের কাছে যে ভয়াবহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেখানে তিনি একেবারে খালি হাতে তার মুখোমুখি হবেন না বরং প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে যাবেন।

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝٣٣ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝٣٤ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ۝٣٥

মূসা নিবেদন করলো, "হে আমার প্রভু! আমি যে তাদের একজন লোককে হত্যা করে ফেলেছি, ভয় হচ্ছে, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।[৪৭] আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে বেশী বাকপটু, তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠাও, যাতে সে আমাকে সমর্থন দেয়, আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে"। বললেন, তোমার ভাইয়ের সাহায্যে আমি তোমার শক্তি বৃদ্ধি করবো এবং তোমাদের দু'জনকে এমনই প্রতিপত্তি দান করবো যে, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনগুলোর জোরে তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই বিজয় লাভ করবে।"[৪৮]

৪৫. অর্থাৎ যখন কোন ভয়াবহ মুহূর্ত আসে, যার ফলে তোমার মনে ভীতির সঞ্চার হয় তখন নিজের বাহু চেপে ধরো। এর ফলে তোমার মন শক্তিশালী হবে এবং ভীতি ও আশংকার কোন রেশই তোমার মধ্যে থাকবে না।

বাহু বা হাত বলতে সম্ভবত ডান হাত বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণভাবে হাত বললে ডান হাতই বুঝানো হয়। চেপে ধরা দু'রকম হতে পারে। এক, হাত পার্শ্বদেশের সাথে লাগিয়ে চাপ দেয়া। দুই, এক হাতকে অন্য হাতের বগলের মধ্যে রেখে চাপ দেয়া। এখানে প্রথম অবস্থাটি প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা বেশী। কারণ এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি অনুভব করতে পারবে না যে, এ ব্যক্তি মনের ভয় দূর করার জন্য কোন বিশেষ কাজ করছে।

হযরত মূসাকে যেহেতু একটি জালেম সরকারের মোকাবিলা করার জন্য কোন সৈন্য সামন্ত ও পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই পাঠানো হচ্ছিল তাই তাঁকে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়। বারবার এমন ভয়ানক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল যাতে একজন মহান দৃঢ়চেতা নবীও আতংকমুক্ত থাকতে পারতেন না। মহান আল্লাহ বলেন, এ ধরনের কোন অবস্থা দেখা দিলে তুমি স্রেফ এ কাজটি করো, ফেরাউন তার সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করেও তোমার মনের জোর শিথিল করতে পারবে না।

৪৬. এ শব্দগুলোর মধ্যে এ বক্তব্য নিহিত রয়েছে যে, এ নিদর্শনগুলো নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং আল্লাহর রসূল হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে ও তার রাষ্ট্রীয় প্রশাসকবৃন্দকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও বন্দেগীর দিকে আহবান

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

তারপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে পৌঁছুলো তখন তারা বললো, এসব বানোয়াট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪৯] *আর এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ দাদার কালে কখনো শুনিনি।*[৫০] *মূসা জবাব দিল, "আমার রব তার অবস্থা ভালো জানেন, যে তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনা নিয়ে এসেছে এবং কার শেষ পরিণতি ভালো হবে তাও তিনিই ভালো জানেন, আসলে জালেম কখনো সফলকাম হয় না।"*[৫১]

জানাও। তাই এখানে তাঁর এ নিযুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বলা হয়নি। তবে কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ত্বা–হা ও সূরা নাযি'আতে বলা হয়েছে اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى "ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।" সূরা আশ্ শূ'আরায় বলা হয়েছে ঃ

اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

"যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বললেন, যাও জালেম জাতির কাছে, ফেরাউনের জাতির কাছে।"

৪৭. এর অর্থ এ ছিল না যে, এ ভয়ে আমি সেখানে যেতে চাই না। বরং অর্থ ছিল, আপনার পক্ষ থেকে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত যার ফলে আমার সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই কোন প্রকার কথাবার্তা ও রিসালাতের দায়িত্বপালন করার আগেই তারা যেন আমাকে হত্যার অপরাধে গ্রেফতার করে না নেয়। কারণ এ অবস্থায় তো আমাকে যে উদ্দেশ্যে এ অভিযানে সেখানে পাঠানো হচ্ছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরবর্তী ইবারত থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত মূসার এ আবেদনের উদ্দেশ্য মোটেই এরূপ ছিল না যে, তিনি ভয়ে নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ এবং ফেরাউনের কাছে যেতে অস্বীকার করতে চাচ্ছিলেন।

৪৮. আল্লাহর সাথে হযরত মূসার এ সাক্ষাত ও কথাবার্তার অবস্থা এর চাইতেও বিস্তারিতভাবে সূরা ত্বা–হার ৯ থেকে ৪৮ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদ এ ব্যাপারে যে বর্ণনা দিয়েছে তাকে যে ব্যক্তি বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ৩ ও ৪ অধ্যায়ের

এতদসংক্রান্ত বর্ণনার সাথে তুলনা করবে, সে যদি কিছুটা ভারসাম্য পূর্ণ রুচির অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে এ দু'য়ের মধ্য থেকে কোন্‌টি আল্লাহর কালাম এবং কোন্‌টিকে মানুষের তৈরি গল্প বলা যাবে তা সে নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে। তাছাড়া কুরআনের এ বর্ণনা নাউযুবিল্লাহ বাইবেল ও ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে নকল করা হয়েছে, না যে আল্লাহ হযরত মূসাকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করিয়েছিলেন তিনি নিজেই আসল ঘটনা বর্ণনা করছেন, এ ব্যাপারেও সে সহজে নিজের মত স্থির করতে পারবে। (আরো বেশী জানতে হলে দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা–হা, ১৯ টীকা)

৪৯. মূলে বলা হয়েছে سِحْرٌ مُّفْتَرًى "বানোয়াট যাদু।" এ বানোয়াটকে যদি মিথ্যা অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, এ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করা মূল জিনিসের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন নয় বরং এটা হচ্ছে নিছক একটি লোক দেখানো প্রতারণামূলক কৌশল, একে মু'জিযা বলে এ ব্যক্তি আমাদের ধোকা দিচ্ছে। আর যদি একে বানোয়াট অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, এ ব্যক্তি কোন কৌশল অবলম্বন করে এমন একটি জিনিস তৈরি করে এনেছে, যা দেখতে লাঠির মতো কিন্তু যখন সে সেটাকে ছুঁড়ে দেয় তখন সাপের মতো দেখায়। আর নিজের হাতেও সে এমন কিছু জিনিস মাখিয়ে নিয়েছে যার ফলে তা বগল থেকে বের হবার পর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ কৃত্রিম যাদু সে নিজেই তৈরি করেছে কিন্তু আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছে এ বলে যে, এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি মু'জিযা।

৫০. রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হযরত মূসা যেসব কথা বলেছিলেন সে দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য জায়গায় এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আন–নাযি'আতে বলা হয়েছে, হযরত মূসা তাকে বলেন ঃ

هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۝ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى–

"তুমি কি পবিত্র–পরিচ্ছন্ন নীতি অবলম্বন করতে আগ্রহী? এবং আমি তোমাকে তোমার রবের পথ বাতলে দিলে কি তুমি ভীত হবে?" (আন–নাযি'আত–১৮–১৯)

সূরা ত্বা–হায়ে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ۝ اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى –(طٰهٰ : ٤٧–٤٨)

"আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আর যে ব্যক্তি সঠিক পথের অনুসারী হয় তার জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আমাদের প্রতি অহী নাযিল করা হয়েছে এ মর্মে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।" আর اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ "আমরা তোমার রবের পয়গম্বর, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।" এ কথাগুলো সম্পর্কেই ফেরাউন বলে, আমাদের বাপ দাদারাও কখনো একথা শোনেনি যে, মিসরের ফেরাউনের উপরেও কোন কর্তৃত্বশালী সত্তা আছে, যে তাকে হুকুম করার ক্ষমতা রাখে, তাকে শাস্তি দিতে পারে, তাকে নির্দেশ দেবার জন্য কোন লোককে তার দরবারে পাঠাতে

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ۚ فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٣٨

আর ফেরাউন বললো, "হে সভাসদবর্গ! তো আমি নিজেকে ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভু আছে বলে জানি না।৫২ ওহে হামান! আমার জন্য ইট পুড়িয়ে একটি উঁচু প্রাসাদ তৈরি করো, হয়তো তাতে উঠে আমি মূসার প্রভুকে দেখতে পাবো, আমিতো তাকে মিথ্যুক মনে করি।।"৫৩

পারে এবং যাকে ভয় করার জন্য মিসরের বাদশাহকে উপদেশ দেয়া যেতে পারে। এ সম্পূর্ণ অভিনব কথা আমরা আজ এক ব্যক্তির মুখে শুনছি।

৫১. অর্থাৎ তুমি আমাকে যাদুকর ও মিথ্যুক গণ্য করছো কিন্তু আমার রব আমার অবস্থা ভালো জানেন। তিনি জানেন তাঁর পক্ষ থেকে যাকে রসূল নিযুক্ত করা হয়েছে সে কেমন লোক। পরিণামের ফায়সালা তাঁরই হাতে রয়েছে। আমি মিথ্যুক হলে আমার পরিণাম খারাপ হবে এবং তুমি মিথ্যুক হলে ভালোভাবে জেনে রাখো তোমার পরিণাম ভালো হবে না। মোট কথা জালেমের মুক্তি নেই, এ সত্য অপরিবর্তনীয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল নয় এবং মিথ্যা রসূল সেজে নিজের কোন স্বার্থোদ্ধার করতে চায় সেও জালেম এবং সেও মুক্তি ও সাফল্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সত্য রসূলকে মিথ্যা বলে এবং ধোকাবাজদের সাহায্যে সত্যকে দমন করতে চায় সেও জালেম এবং সেও কখনো মুক্তি ও সাফল্য লাভ করবে না।

৫২. এ উক্তির মাধ্যমে ফেরাউন যে বক্তব্য পেশ করেছে তার অর্থ এ ছিল না এবং এ হতেও পারতো না যে, আমিই তোমাদের এবং পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। কারণ কেবলমাত্র কোন পাগলের মুখ দিয়েই এমন কথা বের হতে পারতো। অনুরূপভাবে এ অর্থ এও ছিল না এবং হতে পারতো না যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। কারণ মিসরবাসীরা বহু দেবতার পূজা করতো এবং স্বয়ং ফেরাউনকেই যেভাবে উপাস্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল তাও শুধুমাত্র এই ছিল যে, তাকে সূর্য দেবতার অবতার হিসেবে স্বীকার করা হতো। সবচেয়ে বড় সাক্ষী কুরআন মজীদ নিজেই। কুরআনে বলা হয়েছে ফেরাউন নিজে বহু দেবতার পূজারী ছিল ঃ

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ –

"আর ফেরাউনের জাতির সরদাররা বললো, তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে দেবে যে, তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করুক এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদেরকে ত্যাগ করুক?" (আল আ'রাফ : ১২৭)

তাই ফেরাউন এখানে অবশ্যই "ইলাহ" শব্দটি নিজের জন্য স্রষ্টা ও উপাস্য অর্থে নয় বরং সার্বভৌম ও স্বয়ং সম্পূর্ণ শাসক এবং তাকে আনুগত্য করতে হবে, এ অর্থে ব্যবহার করেছিল। তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমিই মিসরের এ সরযমীনের মালিক। এখানে আমারই হুকুম চলবে। আমারই আইনকে এখানে আইন বলে মেনে নিতে হবে। আমারই সত্তাকে এখানে আদেশ ও নিষেধের উৎস বলে স্বীকার করতে হবে। এখানে অন্য কেউ তার হুকুম চালাবার অধিকার রাখে না। এ মূসা কে? সে রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি সেজে দাঁড়িয়েছে এবং আমাকে এমনভাবে হুকুম শুনাচ্ছে যেন সে আসল শাসনকর্তা এবং আমি তার হুকুমের অধীন? এ কারণে সে তার দরবারের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল :

يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ

"হে আমার জাতি! মিসরের বাদশাহী কি আমারই নয় এবং এ নদীগুলো কি আমার অধীনে প্রবাহিত নয়?" (আয্ যুখ্রুফ: ৫১)

আর এ কারণেই সে বারবার হযরত মূসাকে বলছিল :

اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ –

"তুমি কি এসেছো আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে যে পদ্ধতি চলে আসছে তা থেকে আমাদের সরিয়ে দিতে এবং যাতে এদেশে তোমাদের দু'ভাইয়ের আধিপত্য ও কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়?" (ইউনুস :৭৮)

اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى –

"হে মূসা! তুমি কি নিজের যাদুবলে আমাদের ভূখণ্ড থেকে আমাদের উৎখাত করতে এসেছো? (ত্বা-হা : ৫৭)

اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ –

"আমি ভয় করছি এ ব্যক্তি তোমাদের দীন পরিবর্তিত করে দেবে অথবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" (আল মু'মিন : ২৬)

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে যেসব রাষ্ট্র আল্লাহর নবী প্রদত্ত শরীয়াতের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের তথাকথিত রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের দাবীদার, ফেরাউনের অবস্থা তাদের থেকে ভিন্নতর ছিল না। তারা আইনের উৎস এবং আদেশ নিষেধের কর্তা হিসেবে অন্য কোন বাদশাকে মানুক অথবা জাতির ইচ্ছার আনুগত্য

করুক, যতক্ষণ তারা এরূপ নীতি অবলম্বন করে চলবে যে, দেশে আল্লাহ ও তার রসূলের নয় বরং আমাদের হুকুম চলবে, ততক্ষণ তাদের ও ফেরাউনের নীতি ও ভূমিকার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য থাকবে না। এটা ভিন্ন কথা যে, অবুঝ লোকেরা একদিকে ফেরাউনকে অভিসম্পাত করতে থাকে, অন্যদিকে ফেরাউনী রীতিনীতির অনুসারী এসব শাসককে বৈধতার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যের জ্ঞান রাখে, সে শব্দ ও পরিভাষা নয়, অর্থ ও প্রাণশক্তি দেখবে। ফেরাউন নিজের জন্য "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করেছিল এবং এরা সেই একই অর্থে "সার্বভৌমত্বের" পরিভাষা ব্যবহার করছে, এতে এমন কী পার্থক্য সৃষ্টি হয়। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা–হা ২১ টীকা)

৫৩. বর্তমান যুগের রুশীয় কম্যুনিষ্টরা একই ধরনের মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছে। তারা স্পুটনিক ও লুনিকে চড়ে মহাশূন্যে উঠে দুনিয়াবাসীকে খবর দিচ্ছে, আমাদের মহাশূন্য যাত্রীরা উপরে কোথাও আল্লাহর সন্ধান পায়নি।* ওদিকে এ নির্বোধটিও মিনারে উঠে আল্লাহকে দেখতে চাচ্ছিল। এ থেকে জানা যায়, বিভ্রান্ত লোকদের মানসিকতা সাড়ে তিন হাজার বছর আগে যেমনটি ছিল আজও তেমনটিই আছে। এদিক দিয়ে তারা এক ইঞ্চি পরিমাণও উন্নতি করতে পারেনি। জানিনা কোন্ আহাম্মক তাদেরকে এ খবর দিয়েছিল যে, আল্লাহ বিশ্বাসী লোকেরা যে রব্বুল আলামীনকে মানে তিনি তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী উপরে কোথাও বসে আছেন। আর এ কুলকিনারাহীন মহাবিশ্বে কয়েক হাজার ফুট বা কয়েক লাখ মাইল উপরে উঠে যদি তারা তাঁর সাক্ষাত না পায় তাহলে যেন এ কথা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তিনি কোথাও নেই।

কুরআন এখানে একথা বলছে না যে, ফেরাউন সত্যিসত্যিই একটি ইমারত এ উদ্দেশ্যে বানিয়েছিল এবং তাতে উঠে আল্লাহকে দেখার চেষ্টা করেছিল। বরং কুরআন শুধুমাত্র তার এ উক্তি উদ্ধৃত করছে। এ থেকে আপাত দৃষ্টে মনে হয় সে কার্যত এ বোকামি করেনি। এ কথাগুলোর মাধ্যমে কেবলমাত্র মানুষকে বোকা বানানোই ছিল তার উদ্দেশ্য।

ফেরাউন সত্যিই বিশ্ব–জাহানের মালিক ও প্রভূ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো, না নিছক জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে নাস্তিক্যবাদী কথা বার্তা বলতো, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তার উক্তিগুলো থেকে ঠিক একই ধরনের মানসিক অস্থিরতার সন্ধান পাওয়া যায় যেমন রুশ কম্যুনিষ্টদের কথাবার্তায় পাওয়া যায়। কখনো সে আকাশে উঠে দুনিয়াবাসীকে জানাতে চাইতো, আমি উপরে সব দেখে এসেছি, মূসার আল্লাহ কোথাও নেই। আবার কখনো বলতো–

فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ

"যদি সত্যিই মূসা আল্লাহর প্রেরিত হয়ে থাকে, তাহলে কেন তার জন্য সোনার কাঁকন অবতীর্ণ হয়নি অথবা ফেরেশতারা তার আরদালী হয়ে আসেনি কেন?"

* অবশ্য ১৯৯১ তে এসে রুশী কম্যুনিষ্টদের আর আল্লাহর সন্ধানে স্পুটনিকে ও লুনিকে চড়তে হচ্ছে না। এখন বাস্তবতার প্রচণ্ড আঘাতে তারা কম্যুনিজম ত্যাগ করে আল্লাহকে স্বীকৃতি দেবার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। –অনুবাদক

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

সে এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীতে কোন সত্য ছাড়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো [৫৪] এবং মনে করলো তাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না।[৫৫] শেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম।[৫৬] এখন এ জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে দেখে নাও। তাদেরকে আমি জাহান্নামের দিকে আহবানকারী নেতা করেছিলাম[৫৭] এবং কিয়ামতের দিন তারা কোথাও থেকে কোন সাহায্য লাভ করতে পারবে না। এ দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে বড়ই ঘৃণার্হ ও ধিকৃত।[৫৮]

এ কথাগুলো রাশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের কথা থেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। তিনি কখনো আল্লাহকে অস্বীকার করতেন আবার কখনো বারবার আল্লাহর নাম নিতেন এবং তাঁর নামে কসম খেতেন। আমাদের অনুমান, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর খলীফাদের যুগ শেষ হবার পর মিসরে কিবৃতী জাতীয়তাবাদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্বদেশপ্রীতির ভিত্তিতে দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়। এ সময় নতুন নেতৃত্ব জাত্যাভিমানের আবেগে আল্লাহর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হযরত ইউসুফ ও তাঁর অনুসারী ইসরাঈলী এবং মিসরীয় মুসলমানরা তাদেরকে আল্লাহকে মেনে চলার দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন। তারা মনে করলো, আল্লাহকে মেনে নিয়ে আমরা ইউসুফীয় সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত হতে পারবো না এবং এ সংস্কৃতি জীবিত থাকলে আমাদের রাজনৈতিক প্রভাবও শক্তিশালী হতে পারবে না। তারা আল্লাহকে স্বীকৃতি দেবার সাথে মুসলিম কর্তৃত্বকে অংগাংগীভাবে জড়িত মনে করছিল। তাই একটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অন্যটিকে অস্বীকার করা তাদের জন্য জরুরী ছিল, যদিও তার অস্বীকৃতি তাদের অন্তরের ভেতর থেকে বের হয়েও বের হচ্ছিল না।

৫৪. অর্থাৎ এ বিশ্ব-জাহানে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কিন্তু ফেরাউন এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র অংশে সামান্য একটু কর্তৃত্বের

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾

৫ রুকূ'

পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোকে ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম লোকদের জন্য আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক। পথনির্দেশনা ও রহমত হিসেবে, যাতে লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে।[৫৯] (হে মুহাম্মাদ!) তুমি সে সময় পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না[৬০] যখন আমি মূসাকে এ শরীয়াত দান করেছিলাম এবং তুমি সাক্ষীদের অন্তরভুক্তও ছিলে না।[৬১] বরং এরপর (তোমার যুগ পর্যন্ত) আমি বহু প্রজন্মের উদ্ভব ঘটিয়েছি এবং তাদের ওপর অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।[৬২] তুমি মাদ্‌য়ানবাসীদের মধ্যেও উপস্থিত ছিলে না, যাতে তাদেরকে আমার আয়াত শুনাতে পারতে[৬৩] কিন্তু আমি সে সময়কার এসব তথ্য জানাচ্ছি।

অধিকারী হয়ে মনে করে বসলো এখানে একমাত্র তারাই শ্রেষ্ঠ এবং তাদেরই সর্বময় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিরাজিত।

৫৫. অর্থাৎ তারা নিজেদের ব্যাপারে মনে করলো তাদেরকে কোথাও জিজ্ঞাসিত হতে হবে না। আর তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না মনে করে তারা স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ করতে লাগলো।

৫৬. এ শব্দগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের মিথ্যা অহমিকার মোকাবিলায় তাদের নিকৃষ্টতা ও হীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা নিজেদেরকে অনেক বড় কিছু মনে করে বসেছিল। কিন্তু সঠিক পথে আসার জন্য আল্লাহ তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছিলেন তা যখন খতম হয়ে গেলো তখন তাদেরকে এমনভাবে সাগরে নিক্ষেপ করা হলো যেমন খড়কুটা ও ময়লা–আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়।

৫৭. অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তারা একটি দৃষ্টান্ত কায়েম করে গেছে। জুলুম কিভাবে করা হয়, সত্য অস্বীকার করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ওপর কিভাবে অবিচল থাকা যায় এবং সত্যের মোকাবিলায় বাতিলের জন্য লোকেরা কেমন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

আর তুমি তূর পাহাড়ের পাশেও তখন উপস্থিত ছিলে না যখন আমি (মূসাকে প্রথমবার) ডেকেছিলাম। কিন্তু এটা তোমার রবের অনুগ্রহ (যার ফলে তোমাকে এসব তথ্য দেয়া হচ্ছে)[৬৪] যাতে তুমি তাদেরকে সতর্ক করো যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি,[৬৫] হয়তো তারা সচেতন হয়ে যাবে।

করতে পারে, এসব তারা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। দুনিয়াবাসীকে এসব পথ দেখিয়ে দিয়ে তারা জাহান্নামের দিকে এগিয়ে গেছে। এখন তাদের উত্তরসূরীরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে সেই মনযিলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

৫৮. মূলে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তারা "মাকবূহীন"দের অন্তরভুক্ত হবে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তারা হবে প্রত্যাখ্যাত ও বহিষ্কৃত। আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে। তাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় করে দেয়া হবে। তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হবে।

৫৯. অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলো যখন পূর্বের নবীদের শিক্ষাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার অশুভ পরিণাম ভোগ করেছিল এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যরা যে পারিণতি দেখেছিল তাই হলো তাদের শেষ পরিণতি। তখন তার পরে মূসা আলাইহিস সালামকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, যাতে মানব জাতির একটি নব যুগের সূচনা হয়।

৬০. পশ্চিম প্রান্ত বলতে সিনাই উপদ্বীপের যে পাহাড়ে হযরত মূসাকে শরীয়াতের বিধান দেয়া হয়েছিল সেই পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এ এলাকাটি হেজাযের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

৬১. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের সত্তর জন প্রতিনিধি যাদেরকে শরীয়াতের বিধান মেনে চলার অংগীকার করার জন্য হযরত মূসার সাথে ডাকা হয়েছিল। (সূরা আ'রাফের ১৫৫ আয়াতে এ প্রতিনিধিদের ডেকে নেবার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ২৪ অধ্যায়েও এর আলোচনা করা হয়েছে।)

৬২. অর্থাৎ সরাসরি এ তথ্যগুলো লাভ করার কোন উপায় তোমাদের ছিল না। আজ দু'হাজার বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরও যে, তোমরা এ ঘটনাবলীকে এমনভাবে বর্ণনা করছো যেন তোমাদের চোখে দেখা ঘটনা, আল্লাহর অহীর মাধ্যমে এসব তথ্য তোমাদের সরবরাহ করা হচ্ছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া এর আর কোন কারণ নেই।

৬৩. অর্থাৎ যখন হযরত মূসা মাদ্য়ানে পৌছেন, তাঁর সাথে সেখানে যা কিছু ঘটে এবং দশ বছর অতিবাহিত করে যখন তিনি সেখান থেকে রওয়ানা দেন তখন সেখানে কোথাও তোমার কোন পাত্তাই ছিল না। তুমি আজ মক্কার অলিতে গলিতে যে কাজ করে

বেড়াচ্ছো সে সময় মাদ্‌য়ানের জনবসতিগুলোতে সে কাজ করতে না। তুমি চোখে দেখে এ ঘটনাবলীর উল্লেখ করছো না বরং আমার অহীর মাধ্যমেই তোমারা এ জ্ঞানও লাভ করছো।

৬৪. এ তিনটি কথাই পেশ করা হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে। যখন একথাগুলো পেশ করা হয়েছিল তখন মক্কার সমস্ত সরদার ও সাধারণ কাফেররা কোন প্রকারে তাঁকে অ–নবী এবং নাউযুবিল্লাহ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ইয়াহুদী উলামা ও খৃষ্টান 'রাহিব' তথা সংসারত্যাগী–যোগী সন্যাসীরাও হেজাযের জনপদগুলোতে উপস্থিত ছিল। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কোন মহাশূন্য থেকে এসে কুরআন শুনিয়ে যেতেন না। বরং তিনি ছিলেন সেই মক্কারই বাসিন্দা। তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও তাঁর জনপদ ও গোত্রের লোকদের কাছে গোপন ছিল না। এ কারণেই যখন এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের আকারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ এ তিনটি কথা বলা হলো তখন মক্কা, হেজায এবং সারা আরবের কোন এক ব্যক্তিও উঠে এমন বেহুদা কথা বলেনি যা আজকের পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদরা বলছেন। যদিও মিথ্যা তৈরি করার ব্যাপারে তারা এদের চেয়ে কম যেতো না তবুও যে ডাহা মিথ্যা এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারে না তা তারা বলতো কেমন করে। তারা কেমন করে বলতো, হে মুহাম্মাদ, তুমি অমুক অমুক ইহুদী আলেম ও খৃস্টান রাহেবের কাছ থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনেছো! কারণ সারা দেশে এ উদ্দেশ্যে তারা কোন একজনেরও নাম নিতে পারতো না। তারা কারো নাম নেবার সাথে সাথেই প্রমাণ হয়ে যেতো যে, নবী (সা) তার কাছ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করেননি। তারা কেমন করে বলতো, হে মুহাম্মাদ! বিগত ইতিহাস এবং সাহিত্য ও যাবতীয় বিদ্যার গ্রন্থরাজি সম্বলিত একটি লাইব্রেরী তোমার আছে! সেই গ্রন্থরাজির সহায়তায় তুমি এসব বক্তৃতা দিচ্ছো। কারণ লাইব্রেরী তো দূরের কথা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশে পাশে কোথাও থেকে তারা এসব তথ্য সম্বলিত একটি কাগজের টুকরোও বের করতে সক্ষম ছিল না। মক্কার প্রতিটি শিশুও জানতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখাপড়া জানা লোক নন। আবার কেউ একথাও বলতে পারতো না যে, তিনি কিছু অনুবাদক নিযুক্ত করে রেখেছেন, তারা হিব্রু, সুরিয়ানী ও গ্রীক গ্রন্থরাজী থেকে তরজমা করে তাঁকে দেয়। তারপর তাদের সবচেয়ে বড় বেহায়া লোকটিও এ দাবী করার সাহস করতো না যে, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বাণিজ্য সফরে গিয়ে আপনি এ তথ্যাবলী সংগ্রহ করে এনেছিলেন। কারণ এ সফরে তিনি একা ছিলেন না। মক্কারই বাণিজ্যিক কাফেলা প্রত্যেক সফরে তাঁর সাথে থাকতো। যদি তখন কেউ এ ধরনের দাবী করতো তাহলে শত শত জীবিত সাক্ষী এ সাক্ষ দিতো যে, সেখানে তিনি কারো কাছ থেকে কোন পাঠ নেননি। আর তাঁর ইন্তিকালের পর তো দু'বছরের মধ্যেই রোমানদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যদি মিথ্যামিথ্যাই সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে কোন খৃষ্টান রাহেব বা ইহুদী রব্বির সাথে নবী (সা) কোন আলাপ আলোচনা করে থেকে থাকতেন তাহলে রোমান সরকার তিলকে তাল করে দিতো এবং এ প্রপাগাণ্ডা করতে একটুও পিছপাও হতো না যে, মুহাম্মাদ (সা) (নাউযুবিল্লাহ) সবকিছু এখান থেকে শিখে গেছেন এবং এখান থেকে মক্কায় গিয়ে নবী সেজে বসেছেন। মোটকথা যে যুগে কুরআনের

এ চ্যালেঞ্জ কুরাইশদের কাফের ও মুশরিকদের জন্য মৃত্যুর বারতা ঘোষণা করতো এবং তাকে মিথ্যা বলার প্রয়োজন বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদদের তুলনায় তাদের জন্য ছিল অনেক বেশী, সে যুগে কোন ব্যক্তিও কোথাও থেকে এমন কোন উপাদান সংগ্রহ করে আনতে পারেনি যা থেকে একথা প্রমাণ হতে পারতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী ছাড়া এ তথ্যগুলো সংগ্রহ করার দ্বিতীয় এমন কোন মাধ্যম আছে যার উল্লেখ করা যেতে পারে।

একথাও জেনে রাখা উচিত, কুরআন এই চ্যালেঞ্জ শুধু এখানেই দেয়নি বরং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাহিনী প্রসঙ্গে দিয়েছে। হযরত যাকারিয়া ও হযরত মারয়ামের কাহিনী বর্ণনা করে বলেছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ –

"এ হচ্ছে অদৃশ্য খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তুমি তাদের আশেপাশে কোথাও ছিলে না যখন তারা মারয়ামের তত্বাবধানের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে একথা জানার জন্য তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল। তুমি তখনও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা ঝগড়া করছিল। (আলে ইমরান ঃ ৪৪)

হযরত ইউসুফের কাহিনী বর্ণনা করার পর বলা হচ্ছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ –

"এ হচ্ছে গায়েবের খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তুমি তাদের (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইদের) আশেপাশে কোথাও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা নিজেদের করণীয় সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেছিল এবং যখন তারা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল।" (ইউসুফ ঃ ১০২)

অনুরূপভাবে হযরত নূহের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا –

"এ কথাগুলো গায়েবের খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়েছি। তোমার ও তোমার জাতির ইতিপূর্বে এর কোন জ্ঞান ছিল না।"

(হূদ ঃ ৪৯)

এ জিনিসটির বারবার পুনরাবৃত্তি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۫ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

(আর এ আমি এজন্য করেছি যাতে) এমনটি যেন না হয় যে, তাদের নিজেদের কৃতকর্মের বদৌলতে কোন বিপদ তাদের ওপর এসে যায়, আর তারা বলে, "হে আমাদের রব! তুমি কেন আমাদের কাছে কোন রসূল পাঠাওনি? তাহলে তো আমরা তোমার আয়াত মেনে চল্‌তাম এবং ঈমানদারদের অন্তরভুক্ত হতাম।[৬৬]

কিন্তু যখন আমার কাছ থেকে সত্য তাদের কাছে পৌঁছে গেলো তখন তারা বলতে লাগলো, মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল কেন তাকে সে সব দেয়া হলো না?[৬৭] *এর আগে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি?*[৬৮] *তারা বললো, "দু'টোই যাদু,*[৬৯] *যা একে অন্যকে সাহায্য করে।" আর বললো, "আমরা কোনটাই মানি না।"*

যে, আল্লাহর রসূল তার একটি প্রধান যুক্তি এই ছিল যে, শত শত হাজার হাজার বছর আগে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা আসছে একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে। অহী ছাড়া সেগুলো জানার কোন উপায় তাঁর করায়ত্ব নেই। যেসব গুরুত্বপূর্ণ কারণের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন লোকেরা বিশ্বাস করতে চলেছিল যে, যথার্থই তিনি আল্লাহর নবী এবং তাঁর কাছে আল্লাহর অহী আসে এ জিনিসটি ছিল তার অন্যতম। এখন যে কোন ব্যক্তি নিজেই ধারণা করতে পারে, ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীদের জন্য সে যুগে এ চ্যালেঞ্জের প্রতিবাদ করা কতটা গুরুত্ববহ হয়ে থাকতে পারে এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য কিভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে, যদি এ চ্যালেঞ্জের মধ্যে সামান্যতমও কোন দুর্বলতা থাকতো তাহলে তাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ–প্রমাণ সংগ্রহ করা সমকালীন লোকদের জন্য কঠিন হতো না।

৬৫. আরবে হযরত ইসমাঈল ও হযরত শো'আইব আলাইহিমাস সালাম ছাড়া আর কোন নবী আসেননি। প্রায় দু'হাজার বছরের এ সুদীর্ঘ সময়ে বাইরের নবীদের দাওয়াত অবশ্যই সেখানে পৌঁছেছে। যেমন হযরত মূসা, হযরত সুলাইমান ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালামের দাওয়াত। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন নবীর আবির্ভাব সেখানে ঘটেনি।

قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدٰى مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

(হে নবী!) তাদেরকে বলো, "বেশ, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিতাব, যা এ দু'টির চাইতে বেশী হিদায়াতদানকারী হবে; আমি তারই অনুসরণ করবো।[৭০] *এখন যদি তারা তোমার এ দাবী পূর্ণ না করে, তাহলে জেনে রাখো, তারা আসলে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত ছাড়াই নিছক নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হবে? আল্লাহ এ ধরনের জালেমদেরকে কখনো হিদায়াত দান করেন না।*

৬৬. এ জিনিসটিকেই কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে রসূল পাঠাবার কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সঠিক হবে না যে, এ উদ্দেশ্যে সব সময় প্রত্যেক জায়গায় একজন রসূল আসা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় একজন রসূলের পয়গাম তার সঠিক আকৃতিতে বিদ্যমান থাকে এবং লোকদের কাছে তা পৌঁছে যাবার মাধ্যমও অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষণ কোন নতুন রসূলের প্রয়োজন হয় না। তবে যদি আগের নবীর আনীত শরীয়াতের মধ্যে কোন কিছু বৃদ্ধি করার এবং কোন নতুন বিধান দেবার প্রয়োজন হয় তাহলে নতুন রসূল আসেন। অবশ্যই যখন নবীদের পয়গাম বিলুপ্ত হয়ে যায় অথবা গোমরাহীর মধ্যে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, তা থেকে হিদায়াত লাভের কোন উপায় থাকে না। তখন লোকদের জন্য এ ওজর পেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমাদের হক ও বাতিলের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন করার ও সঠিক পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থাই আদতে ছিল না, এ অবস্থায় আমরা কেমন করে হিদায়াত লাভ করতে পারতাম! এ অজুহাত দেখানোর পথ বন্ধ করার জন্য মহান আল্লাহ এ ধরনের অবস্থায় নবী পাঠান, যাতে এর পর যে ব্যক্তিই ভুল পথে চলবে তাকে সে জন্য দায়ী করা সম্ভব না হয়।

৬৭. অর্থাৎ হযরত মূসাকে (আ) যেসব মু'জিযা দেয়া হয়েছিল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে সবগুলো দেয়া হলো না কেন? ইনিও লাঠিকে সাপ বানিয়ে আমাদের দেখাতেন। এঁর হাতও বগল থেকে বের করার পর সূর্যের মতো উজ্জ্বল্য বিকীরণ করতো। এঁর ইশারায়ও অস্বীকারকারীদের ওপর একের পর এক তুফান এবং আকাশ ও পৃথিবীর বালা-মুসীবত নাযিল হতো। ইনিও পাথরের গায়ে লিখিত বিধান এনে আমাদের দিতেন।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

৬ রুকূ'

আর আমি তো অনবরত তাদের কাছে (উপদেশ বাণী) পৌছিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা গাফলতি থেকে সজাগ হয়ে যায়।[৭১]

যাদেরকে আমি এর আগে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর (কুরআন) প্রতি ঈমান আনে।[৭২] *আর যখন তাদেরকে এটা শুনানো হয়, তারা বলে, "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এটি যথার্থই সত্য আমাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তো আগে থেকেই মুসলিম।"*[৭৩]

৬৮. এ হচ্ছে তাদের অভিযোগের জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, এসব মু'জিযা সত্ত্বেও তোমরা কি মূসার (আ) প্রতি ঈমান এনেছিলে? তাহলে আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সেগুলোর দাবী করছো কেন? তোমরা নিজেরাই বলছো, মূসাকে এসব মু'জিযা দেয়া হয়েছিল কিন্তু তার পরও তোমরা তাঁকে নবী বলে মেনে নিয়ে কোনদিন তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করোনি। সূরা সাবার ৩১ আয়াতেও মক্কার কাফেরদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ "আমরা এই কুরআনও মানবো না, এর আগের কিতাবগুলোকেও মানবো না।"

৬৯. অর্থাৎ কুরআন ও তাওরাত।

৭০. অর্থাৎ আমাকে তো হিদায়াতের অনুসরণ করতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তা কারো মনগড়া হলে হবে না। বরং হতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকৃত ও যথার্থ হিদায়াত। যদি তোমাদের কাছে এমন কোন কিতাব থাকে যা কুরআন ও তাওরাতের চাইতে ভালো পথ নির্দেশনা দিতে পারে তাহলে তোমরা তাকে লুকিয়ে রেখেছো কেন? তাকে সবার সামনে নিয়ে এসো। আমি বিনা দ্বিধায় তার বিধান মেনে চলবো।

৭১. অর্থাৎ উপদেশের ব্যাপারে আমি কোন কসুর করিনি। এ কুরআনে আমি অনবরত উপদেশ বিতরণ করে এসেছি। কিন্তু যে জিদ ও একগুঁয়েমী পরিহার করে হৃদয়কে বিদ্বেষমুক্ত রেখে সত্যকে সোজাসুজি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় সে-ই একমাত্র হিদায়াত লাভ করতে পারে।

৭২. এর অর্থ এটা নয় যে, সমস্ত আহ্‌লি কিতাব (ইহুদী ও ঈসায়ী) এর প্রতি ঈমান আনে। বরং এ সূরা নাযিল হবার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল এখানে আসলে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মক্কাবাসীদেরকে এই মর্মে লজ্জা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের

নিজেদের গৃহে যে নিয়ামত এসেছে তাকে তোমরা প্রত্যাখ্যান করছো। অথচ দূর দেশ থেকে লোকেরা এর খবর শুনে আসছে এবং এর মূল্য অনুধাবন করে এ থেকে লাভবান হচ্ছে।

ইবনে হিশাম ও বাইহাকী এবং অন্যরা এ ঘটনাকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তি এবং তার দাওয়াতের খবর যখন সেই দেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সেখান থেকে প্রায় ২০ জনের একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য মক্কা মু'আয্যমায় এলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে হারামে সাক্ষাত করলো। কুরাইশদের বহু লোকও এ ব্যাপার দেখে আশপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রতিনিধি দলের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু প্রশ্ন করলেন। তিনি সেগুলোর জবাব দিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন মজীদের আয়াত তাদের সামনে পাঠ করলেন। কুরআন শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। তারা একে আল্লাহর বাণী বলে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করলেন এবং নবীর (সা) প্রতি ঈমান আনলেন। মজলিস শেষ হবার পর আবু জেহেল ও তার কয়েকজন সাথী প্রতিনিধিদলের লোকদেরকে পথে ধরলো এবং তাদেরকে যাচ্ছে তাই বলে তিরস্কার করলো। তাদেরকে বললো, "তোমাদের সফরটাতো বৃথাই হলো। তোমাদের স্বধর্মীয়রা তোমাদেরকে এজন্য পাঠিয়েছিল যে, এ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তোমরা যথাযথ অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত ও যথার্থ ঘটনা তাদেরকে জানাবে। কিন্তু তোমরা সবেমাত্র তার কাছে বসেছিলে আর এরি মধ্যেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে তার প্রতি ঈমান আনলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কখনো আমরা দেখিনি।" একথায় তারা জবাব দিল, "ভাইয়েরা, তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সাথে জাহেলী বিতর্ক করতে চাই না। আমাদের পথে আমাদের চলতে দাও এবং তোমরা তোমাদের পথে চলতে থাকো। আমরা জেনেবুঝে কল্যাণ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করতে পারি না।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা এবং আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩ খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা শূ'আরা, ১২৩ টীকা)

৭৩. অর্থাৎ এর আগেও আমরা নবীদের ও আসমানী কিতাবের আনুগত্য করে এসেছি। তাই ইসলাম ছাড়া আমাদের অন্য কোন দীন ছিল না। এখন যে নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এনেছেন তাকেও আমরা মেনে নিয়েছি। কাজেই মূলত আমাদের দীনের কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং আগেও যেমন আমরা মুসলমান ছিলাম তেমনি এখনও মুসলমান আছি।

একথা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন কেবলমাত্র তার নামই ইসলাম নয় এবং "মুসলিম" পরিভাষাটি শুধুমাত্র নবী করীমের (সা) অনুসারীগণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সব সময় এ ইসলামই ছিল সকল নবীর দীন এবং সব জামানায় তাঁদের সবার অনুসারীগণ মুসলমানই ছিলেন। এ মুসলমানরা যদি কখনো পরবর্তীকালে আগত কোন সত্য নবীকে মানতে অস্বীকার করে থাকে তাহলে কেবল তখনই তারা কাফের হয়ে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু যারা পূর্বের নবীকে মানতো এবং পরে আগত নবীকেও মেনে নিয়েছে তাদের ইসলামে কোন ছেদ পড়েনি। তারা পূর্বেও যেমন মুসলমান ছিল, পরেও তেমনি থেকেছে।

আশ্চর্যের কথা, বড় বড় জ্ঞানীগুণী ও আলেমদের মধ্যেও কেউ কেউ এ সত্যটি অনুধাবন করতে অক্ষম হয়েছেন। এমনকি এ সুস্পষ্ট আয়াতটি দেখেও তাঁরা নিশ্চিন্ত হননি। আল্লামা সুয়ুতী "মুসলিম" পরিভাষাটি কেবলমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সাথেই বিশেষভাবে জড়িত এ মর্মে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত একটি বই লিখেছেন। তারপর যখন এ আয়াতটি সামনে এসেছে তখন নিজেই বলেছেন, এখন তো আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। কিন্তু এরপর বলছেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম এ মর্মে যে, এ ব্যাপারে আমার হৃদয় প্রসারিত করে দাও। শেষে নিজের অভিমত প্রত্যাহার করার পরিবর্তে তিনি তারই ওপর জোর দিয়েছেন এবং এ আয়াতটির কয়েকটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। এ ব্যাখ্যাগুলোর একটি অন্যটির চেয়ে বেশী ওজনহীন। যেমন তাঁর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমরা কুরআন আসার আগেই মুসলিম হয়ে যাবার সংকল্প পোষণ করতাম। কারণ আমাদের কিতাবসমূহ থেকে আমরা এর আসার খবর পেয়ে গিয়েছিলাম এবং আমাদের সংকল্প ছিল, তিনি আসলেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করে নেবো। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে, এ বাক্যাংশে مُسْلِمِينَ শব্দের পরে بِهٖ শব্দ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আগে থেকেই আমরা কুরআন মানতাম। কারণ আমরা তাঁর আগমনের আশা পোষণ করতাম এবং পূর্বাহ্নেই তাঁর প্রতি ঈমান এনে বসেছিলাম। তাই তাওরাত ও ইনজিল মানার ভিত্তিতে নয় বরং কুরআনকে তার নাযিল হবার পূর্বে যথার্থ সত্য বলে মেনে নেবার জন্যই আমরা মুসলিম ছিলাম। তৃতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ আল্লাহর তাকদীরে পূর্বেই আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের আগমনে আমরা ইসলাম গ্রহণ করে নেবো। তাই আসলে আমরা আগে থেকেই মুসলিম ছিলাম। এই ব্যাখ্যাগুলোর মধ্য থেকে কোনটি দেখেও আল্লাহ প্রদত্ত হৃদয়ের প্রশস্ততার কোন প্রভাব সেখানে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, কুরআন কেবলমাত্র এই একটি স্থানেই নয় বরং অসংখ্য জায়গায় এ সত্যটি বর্ণনা করেছে। কুরআন বলছে, আসল দীন হচ্ছে একমাত্র "ইসলাম" (আল্লাহর আনুগত্য) এবং আল্লাহর বিশ্ব–জাহানে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য এছাড়া দ্বিতীয় কোন দীন ও ধর্ম হতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যে নবীই মানুষকে পথ নির্দেশ দেবার জন্য এসেছেন তিনি এ দীন নিয়েই এসেছেন। আর নবীগণ হামেশাই নিজেরা মুসলিম থেকেছেন, নিজেদের অনুসারীদেরকে মুসলিম হয়ে থাকার তাকিদ করেছেন এবং তাঁদের যেসব অনুসারী নবুওয়াতের মাধ্যমে আগত আল্লাহর ফরমানের সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছেন তারাও প্রতি যুগে মুসলিমই ছিলেন। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধুমাত্র গুটিকয় আয়াত পেশ করছি ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

"আসলে আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দীন।" (আলে ইমরান ঃ ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ –

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অবলম্বন করে তা কখনো গৃহীত হবে না।" (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বলেন ঃ

اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

"আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আল্লাহর এবং আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে আমি যেন মুসলিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাই।" (ইউনুস ঃ ৭২)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সন্তানদের সম্পর্কে বলা হয় ঃ

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ –

"যখন তার রব তাকে বললেন, মুসলিম (ফরমানের অনুগত) হয়ে যাও, সে বললো আমি মুসলিম হয়ে গেলাম রব্বুল আলামীনের জন্য। আর এ জিনিসটিরই অসিয়াত করে ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবও ঃ হে আমার সন্তানরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনটিই পছন্দ করেছেন। কাজেই মুসলিম না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকূবের মৃত্যুর সময় এসে গিয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার বন্দেগী করবে? তারা জবাব দিয়েছিল আমরা বন্দেগী করবো আপনার মাবুদের এবং আপনার বাপ–দাদা ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের মাবুদের তাঁকে একক মাবুদ হিসেবে মেনে নিয়ে। আর আমরা তাঁরই অনুগত– মুসলিম।" (আল বাকারাহ ঃ ১৩১–১৩৩)

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ

"ইবরাহীম ইহুদী ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না বরং ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম।"
(আলে ইমরান ঃ ৬৭)

হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) নিজেই দোয়া করেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ –

"হে আমাদের রব! আমাকে তোমার মুসলিম (অনুগত) করো এবং আমাদের বংশ থেকে একটি উম্মত সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম।" (আল বাকারাহ ঃ ১২৮)

হযরত লূতের কাহিনীতে বলা হচ্ছে ঃ

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমরা লূতের জাতির জনপদে একটি ঘর ছাড়া মুসলমানদের আর কোন ঘর পাইনি।" (আয্–যারিয়াত ঃ ৩৬)

হযরত ইউসুফ (আ) মহিমান্বিত রবের দরবারে নিবেদন করেন ঃ

تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ –

"আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করো এবং সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিয়ে দাও।" (ইউসুফ ঃ ১০১)

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর নিজের জাতিকে বলেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ –

"হে আমার জাতি। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো, তাহলে তাঁরই ওপর ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।" (ইউনুস ঃ ৮৪)

বনী ইসরাঈলের আসল ধর্ম ইহুদীবাদ নয় বরং ইসলাম ছিল। বন্ধু ও শত্রু সবাই একথা জানতো। কাজেই ফেরাউন সাগরে ডুবে যেতে যেতে যে শেষ কথাটি বলে তা হচ্ছে ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমি মেনে নিলাম বনী ইসরাইল যার প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তরভুক্ত।" (ইউনুস ঃ ৯০)

বনী ইসরাঈলদের সকল নবীর দীনও ছিল এ ইসলাম ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا ،

"আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, সে অনুযায়ী সে নবীগণ যারা মুসলিম ছিল তাদের বিষয়াদির ফায়সালা করতো যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছিল।" (আল মায়েদাহ ঃ ৪৪)

এটিই ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দীন। সেজন্য সাবার রাণী তাঁর প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে বলছেন ঃ

اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মুসলিম হয়ে গেলাম" (আন্ নামূল ঃ ৪৪)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

তারা এমন লোক যাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক দেয়া হবে[৭৪] এমন অবিচলতার প্রতিদানে যা তারা দেখিয়েছে।[৭৫] তারা ভালো দিয়ে মন্দের মোকাবিলা করেছে[৭৬] এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৭৭] আর যখন তারা বাজে কথা শুনেছে,[৭৮] একথা বলে তা থেকে আলাদা হয়ে গেছে যে, "আমাদের কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্মকাণ্ড তোমাদের জন্য, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা মূর্খদের মতো পথ অবলম্বন করতে চাই না।" হে নবী! তুমি যাকে চাও তাকে হিদায়াত দান করতে পারো না কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন এবং যারা হিদায়াত গ্রহণ করে তাদেরকে তিনি খুব ভাল করেই জানেন।[৭৯]

আর এটিই ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর হাওয়ারীদের (সহযোগী) দীন ঃ

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۚ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ -

"আর যখন আমি হওয়ারীদের কাছে অহী পাঠালাম এ মর্মে যে, ঈমান আনো আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি তখন তারা বললো, আমরা ঈমান এনেছি এবং সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম।" (আল মায়েদাহ ঃ ১১১)

যদি সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, আরবী ভাষার "ইসলাম" ও "মুসলিম" শব্দ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় কেমন করে ব্যবহৃত হতে পারতো, তাহলে বলতে হয় যে, এটা নিছক একটা অজ্ঞতাপ্রসূত কথা। কারণ এ আরবী শব্দগুলো আসল বিবেচ্য নয়, আরবী ভাষায় এ শব্দগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেটিই মূল বিবেচ্য বিষয়। আসলে এ আয়াতগুলোতে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে

প্রকৃত দীনটি এসেছে তা খৃষ্টবাদ, মূসাবাদ বা মুহাম্মাদবাদ নয় বরং তা হচ্ছে নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে আগত আল্লাহর ফরমানের সামনে আনুগত্যের শির নত করে দেয়া এবং এ নীতি আল্লাহর যে বান্দা যেখানেই যে যুগেই অবলম্বন করেছে সে হয়েছে একই বিশ্বজনীন, আদি ও চিরন্তন সত্যদীনের অনুসারী। যারা এ দীনকে যথার্থ সচেতনতা ও আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ করেছে তাদের জন্য মূসার পরে ঈসাকে এবং ঈসার পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নেয়া ধর্ম পরিবর্তন করা হবে না বরং হবে প্রকৃত ও আসল ধর্মের অনুসরণ করার স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত দাবী। পক্ষান্তরে যারা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের উম্মতের মধ্যে না জেনে বুঝে ঢুকে পড়েছে অথবা তাঁদের দলে জন্ম নিয়েছে এবং জাতীয় ও বংশীয় স্বার্থপ্রীতি যাদের জন্য আসল ধর্মে পরিণত হয়ে গেছে তারা ইহুদী ও খৃষ্টান হয়ে রয়ে গেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেছে। কারণ তারা আল্লাহর শেষ নবীকে অস্বীকার করেছে। আর এটা করে তারা শুধু যে নিজেদের ভবিষ্যতে মুসলিম হয়ে থাকাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাই নয় বরং নিজেদের এ কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা আসলে ইতিপূর্বেও "মুসলিম" ছিল না নিছক একজন নবীর বা কয়েকজন নবীর ব্যক্তিত্বের ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল। অথবা পিতা-প্রপিতার অন্ধ অনুকরণকে ধর্মীয় আচারে পরিণত করে রেখেছিল।

৭৪. অর্থাৎ একটি পারিশ্রমিক দেয়া হবে সাইয়েদিনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইতিপূর্বে যে ঈমান রাখতো সেজন্য এবং দ্বিতীয় পারিশ্রমিকটি দেয়া হবে এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার জন্য। একথাটিই একটি হাদীসে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ثلثه لهم اجران ، رجل من اهل الكتاب امن بنبيه و امن بمحمد....

"তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। তাদের একজন হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে আহ্‌লি কিতাবের আন্তরভূক্ত ছিল এবং নিজের নবীর প্রতি ঈমান রাখতো, তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিও ঈমান আনে।"

৭৫. অর্থাৎ তাদের এ দ্বিগুণ প্রতিদান লাভ করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা জাতীয়, বংশীয়, দলীয় ও স্বদেশের স্বার্থপ্রীতি মুক্ত থেকে সত্য দীনের ওপর অবিচল ছিল এবং নতুন নবীর আগমনে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাতে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, আসলে তারা ঈসা পূজারী নয় বরং আল্লাহ পূজারী ছিল। তারা ব্যক্তি ঈসার ভক্ত-অনুরক্ত ছিল না বরং ছিল "ইসলামের" আনুগত্যকারী। একারণে ঈসার পর যখন অন্য নবী ঈসার মত সেই একই ইসলাম নিয়ে এলেন তখন তারা দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের পথ অবলম্বন করলো এবং যারা খৃষ্টবাদের ওপর অবিচল ছিল তাদের পথ পরিহার করলো।

৭৬. অর্থাৎ তারা মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে নয় বরং ভালো দিয়ে দেয়। মিথ্যার মোকাবিলায় মিথ্যা নয় বরং সত্য নিয়ে আসে। জুলুমকে জুলুম দিয়ে নয় বরং ইনসাফ দিয়ে প্রতিরোধ করে। দুষ্টামির মুখোমুখি দুষ্টামির সাহায্যে নয় বরং ভদ্রতার সাহায্যে হয়।

৭৭. অর্থাৎ তারা সত্যের পথে সম্পদ উৎসর্গও করে। সম্ভবত এখানে এদিকেও ইংগিত করা হয়েছে যে, তারা নিছক সত্যের সন্ধানে হাবৃশা থেকে সফর করে মক্কায় এসেছিল। এ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পেছনে তাদের কোন বৈষয়িক লাভের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা যখন শুনলো মক্কায় এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করেছেন তখন তারা নিজেরা সশরীরে এসে অনুসন্ধান চালানো জরুরী মনে করলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে অনুসন্ধানের পর যদি প্রমাণিত হয় তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন সত্য নবী, তাহলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর থেকে পথ–নির্দেশনা লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

৭৮. আবু জেহেল ও তার সাথীরা হাবৃশার খৃষ্টান প্রতিনিধিদলের সাথে যেসব আজে বাজে কথা বলেছিল সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। উপরে ৭২ টীকায় এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

৭৯. আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে একথা প্রকাশিত হয় যে, হাবৃশার খৃষ্টানদের ঈমান ও ইসলামের কথা উল্লেখ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল আসলে মক্কার কাফেরদেরকে লজ্জা দেয়া। বক্তব্য ছিল ঃ অভাগার দল! তোমরা নিজেদের কপাল কিভাবে পুড়াচ্ছ তা ভেবে দেখো। অন্যেরা কোথায় কোন্ দূরদেশ থেকে এসে এ নিয়ামতের কল্যাণ লাভে ধন্য হচ্ছে আর তোমরা তোমাদের নিজেদের গৃহ অভ্যন্তরে এই যে কল্যাণের স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে এ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছো। কিন্তু কথাটা এভাবে বলা হয়েছে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তুমি চাচ্ছো তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমার ভাই–বন্ধু, বান্ধবরা, তোমার আত্মীয়–স্বজনরা এই আবেহায়াতের সঞ্জীবনী ধারায় লাভবান হোক কিন্তু তুমি চাইলে কি হবে, হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে, যেসব লোকের মধ্যে তিনি এ হিদায়াত গ্রহণ করার আগ্রহ দেখতে পান তাদেরকেই এ কল্যাণ ধারায় অবগাহন করান। তোমার আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে যদি এই আগ্রহ না দেখা যায় তাহলে এ কল্যাণ তাদের ভাগ্যে কেমন করে জুটতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুসারে এ আয়াতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালেবের প্রসংগে নাযিল হয়। তাঁর শেষ সময় উপস্থিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সামর্থ মোতাবেক কালেমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর প্রতি তাঁর ঈমান আনাবার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা চালান। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর চাচা ঈমানের মধ্য দিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করুন। কিন্তু চাচা তা গ্রহণ না করে আবদুল মুত্তালিবের অনুসৃত ধর্মের মধ্যে অবস্থান করে জীবন দেয়াকে অগ্রাধিকার দেন। এ ঘটনায় আল্লাহ বলেন, انك لا تهدى من احببت "তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে হিদায়াত করতে পারো না।" কিন্তু মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরগণের পরিচিত পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, একটি আয়াত নবীর জামানায় যে বিশেষ ঘটনা বা ব্যাপারের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তাকে তাঁরা আয়াতটির শানে নুযুল বা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ও কার্যকারণ হিসেবে বর্ণনা করেন। তাই এ হাদীসটি এবং এ বিষয়বস্তু সম্বলিত তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ ইত্যাদিতে আবু হুরাইরাহ (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে উমর (রা), প্রমুখ সাহাবীগণ বর্ণিত অন্যান্য হাদীসগুলো থেকে অনিবার্যভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না যে, সূরা আল

وَقَالُوٓا اِنۡ نَّـتَّبِعِ الۡهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ اَرۡضِنَا ؕ اَوَلَمۡ نُمَكِّنۡ لَّهُمۡ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجۡبٰٓى اِلَيۡهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىۡءٍ رِّزۡقًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَلٰـكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۵۷﴾ وَكَمۡ اَهۡلَـكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ ۭ بَطِرَتۡ مَعِيۡشَتَهَا ۚ فَتِلۡكَ مَسٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَنۡ مِّنۡۢ بَعۡدِهِمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا ؕ وَكُنَّا نَحۡنُ الۡوٰرِثِيۡنَ ﴿۵۸﴾

তারা বলে, "যদি আমরা তোমার সাথে এ হেদায়াতের অনুসরণ করি তাহলে নিজেদের দেশ থেকে আমাদেরকে উৎখাত করে দেয়া হবে।[৮০]

এটা কি সত্য নয়, একটি নিরাপদ হারমকে আমি তাদের জন্য অবস্থান স্থলে পরিণত করেছি, যেদিকে সব ধরনের ফলমূল চলে আসে আমার পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[৮১]

আর এমন কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যেখানকার লোকেরা তাদের সম্পদ–সম্পত্তির দম্ভ করতো। কাজেই দেখে নাও, ঐসব তাদের ঘরবাড়ি পড়ে আছে, যেগুলোর মধ্যে তাদের পরে কদাচিত কেউ বসবাস করেছে, শেষ পর্যন্ত আমিই হয়েছি উত্তরাধিকারী।[৮২]

কাসাসের এ আয়াতটি আবু তালেবের ইন্তেকালের সময় নাযিল হয়েছিল। বরং এ থেকে শুধুমাত্র এতটুকু জানা যায় যে, এ আয়াতের বিষয়বস্তুর সত্যতা ও বাস্তবতা এ ঘটনার সময়ই সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়। যদিও আল্লাহর প্রত্যেকটি বান্দাকে সঠিক পথে নিয়ে আসা ছিল নবী করীমের (সা) আন্তরিক ইচ্ছা, তথাপি কোন ব্যক্তির কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করা যদি তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী কষ্টকর হতো এবং ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে যদি কোন ব্যক্তির হিদায়াত লাভ করার তিনি সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ও আকাংখা পোষণ করতেন তাহলে তিনি ছিলেন আবু তালেব। কিন্তু তাঁকেই হিদায়াত দান করার শক্তি যখন তিনি লাভ করলেন না তখন একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কাউকে হিদায়াত দান করা এবং কাউকে তা থেকে বঞ্চিত করা নবীর কাজ নয়। এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহর কাছ থেকে এ সম্পদটি কোন আত্মীয়তা ও পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় বরং মানুষের সত্যানুরাগ, সত্যপ্রীতি ও সত্যাগ্রহী মানসিকতার ভিত্তিতেই দান করা হয়।

৮০. কুরাইশ বংশীয় কাফেররা ইসলাম গ্রহণ না করার ওজুহাত হিসেবে একথাটি বলতো। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে জানা যাবে, এটিই ছিল তাদের কুফরীর সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কারণ। একথাটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে আমাদের দেখতে হবে ঐতিহাসিকভাবে সেসময় কুরাইশদের কি মর্যাদা ছিল, যার ওপর আঘাত আসার আশংকা ছিল।

শুরুতে আরবে যে জিনিসটির জন্য কুরাইশ গোষ্ঠী গুরুত্ব লাভ করে, সেটি হচ্ছে তাদের হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর হওয়ার বিষয়টি আরবীয় বংশধারার দিক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ছিল। এ কারণে তাদের বংশটি ছিল আরবদের দৃষ্টিতে পীরজাদার বংশ। তারপর যখন কুসাই ইবনে কিলাবের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কারণে তারা কাবা গৃহের মুতাওয়াল্লী ও পরিচালকে পরিণত হলো এবং মক্কায় তাদের আবাস গড়ে উঠলো তখন তাদের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে গেলো। কারণ এখন তারা ছিল আরবের সবচেয়ে বড় তীর্থ স্থানের পরিচালক। আরবের সকল গোত্রের মধ্যে তারা ধর্মীয় পুরোহিতের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর হজ্জের কারণে আরবের এমন কোন গোত্র ছিল না যারা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতো না। এ কেন্দ্রীয় মর্যাদাকে পুঁজি করে কুরাইশরা ক্রমান্বয়ে ব্যবসায়িক উন্নতি লাভ করতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে রোম ও ইরানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তাদেরকে আন্তরজাতিক বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করে। সেসময় রোম, গ্রীস, মিসর ও সিরিয়ার যত প্রকার বাণিজ্য চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার সাথে চলতো তার সমস্ত পথই ইরান বন্ধ করে দিয়েছিল। লোহিত সাগরের পথটিই ছিল সর্বশেষ পথ। একমাত্র এ পথটিই খোলা ছিল। পরে ইরান যখন ইয়ামন দখল করে নিল, তখন সে এ পথটিও বন্ধ করে দিল। এখন আরব বণিকরা একদিকে রোম অধিকৃত এলাকার পণ্য সম্ভার আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের বন্দরসমূহে পৌছিয়ে দিতে লাগলো এবং অন্যদিকে একই বন্দরসমূহ থেকে পূর্বদেশীয় বাণিজ্যপণ্য নিয়ে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পৌছাতে থাকলো। এছাড়া এ বাণিজ্যটি চালু রাখার আর কোন পথ খোলা ছিল না। এ অবস্থার ফলে মক্কা আন্তরজাতিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হলো। এ সময় কুরাইশরাই বলতে গেলে এ ব্যবসায়ের ইজারাদারী লাভ করে বসেছিল। কিন্তু যেসব উপজাতীয় এলাকার মধ্য দিয়ে এ বাণিজ্য পথগুলো গিয়েছিল তাদের সাথে আরবদের গভীর বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছাড়া আরবের রাজনৈতিক অরাজকতার পরিবেশে এ ব্যবসায়িক আদান প্রদান সম্ভবপর ছিল না। এ উদ্দেশ্যে কুরাইশ সরদাররা শুধুমাত্র নিজেদের ধর্মীয় প্রভাবের ওপর নির্ভর করতে পারতো না। এজন্য তারা সকল উপজাতির সাথে সন্ধিচুক্তি সাক্ষর করে রেখেছিল। ব্যবসায়িক মুনাফায়ও তাদেরকে অংশীদার করতো। উপজাতীয় শেখ ও প্রভাবশালী সদারদেরকে মূল্যবান তোহ্‌ফা দিয়েও তুষ্ট করতো। এই সংগে পাতা ছিল সূদী ব্যবসায়ের জাল। এতে জড়িয়ে পড়েছিল প্রায় সকল প্রতিবেশী উপজাতীয় ব্যবসায়ী ও সরদারবৃন্দ।

এ অবস্থায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে লাগলো তখন বাপ–দাদার ধর্মের প্রতি অন্ধপ্রীতির চাইতে বড় হয়ে যে জিনিসটি কুরাইশদেরকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠার কারণ হয়ে দেখা দিল সেটি ছিল এই যে, এ দাওয়াতের ফলে তারা নিজেদের স্বার্থহানির আশংকা করছিল। তারা মনে করছিল, যুক্তিপূর্ণ দলিল–প্রমাণের মাধ্যমে শিরক ও মূর্তিপূজা মিথ্যা এবং তাওহীদ সঠিক প্রমাণিত হয়ে গেলেও তো তাকে পরিত্যাগ করে একে গ্রহণ করে নেয়া আমাদের জন্য ধ্বংসকর হবে। এমনটি করার সাথে সাথেই সমগ্র আরবের অধিবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে

ফেটে পড়বে। কাবাগৃহের পরিচালনার দায়িত্ব থেকে আমাদের সরিয়ে দেবে। সন্ধি চুক্তির ফলে মূর্তিপূজক উপজাতিগুলোর সাথে আমাদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যার ভিত্তিতে আমাদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত আরবের বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা সবই ছিন্ন হয়ে যাবে। এভাবে এ দীনটি আমাদের ধর্মীয় প্রভাব–প্রতিপত্তি এবং এই সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও অবসান ঘটাবে। বরং বিচিত্র নয় যে, আরবের সমস্ত উপজাতি মিলে আমাদের মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করবে।

এখানে এসে দুনিয়া পূজারীদের প্রজ্ঞা ও অন্তরদৃষ্টির অভাবের এক বিস্ময়কর চিত্র মানুষের সামনে ফুটে ওঠে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দান করছিলেন যে, তোমাদের সামনে আমি যে কালেমা পেশ করছি তা মেনে নাও, আরব ও আজম তোমাদের পদানত হয়ে যাবে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সা'দ, ভূমিকা ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি) কিন্তু তারা এর মধ্যে নিজেদের মৃত্যু দেখছিল। তারা মনে করছিল, আমরা আজ যে সম্পদ ও প্রভাব–প্রতিপত্তি লাভ করেছি এও খতম হয়ে যাবে। তারা আশংকা করছিল, এ কালেমা গ্রহণ করার সাথে সাথেই আমরা এ সরযমীনে এমনই বন্ধু–বান্ধব ও সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়বো যে, চিল–কাকেরা আমাদের গায়ের গোশ্‌ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে তারা এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল না যে, মাত্র কয়েক বছর পরেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হতে যাচ্ছিল। তারপর এ একই প্রজন্মের জীবনকালেই ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিসর সব দেশই এক এক করে এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতাধীন হতে চলছিল। আর এ উক্তির পরে এক শতক অতিক্রান্ত হবার আগেই কুরাইশ বংশীয় খলিফাগণই সিন্ধু থেকে স্পেন এবং কাফ্‌কাজ থেকে ইয়ামনের উপকূলীয় এলাকা পর্যন্ত দুনিয়ার একটি বৃহত্তম অংশের শাসন পরিচালনা করতে যাচ্ছিল।

৮১. এটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের আপত্তির প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, যে হারমের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বদৌলতে আজ তোমরা এমন যোগ্যতার অধিকারী হয়েছো, যার ফলে সারা দুনিয়ার বাণিজ্যপণ্যের স্রোত এহেন অনুর্বর ধূলিবিবর্ণ উপত্যকায় চলে আসছে, তার এই নিরাপদ ও কেন্দ্রীয় মর্যাদা কি তোমাদের কোন কৌশল অবলম্বনের ফলে অর্জিত হয়েছে? আড়াই হাজার বছর আগে আল্লাহর এক বান্দা জনশূন্য পাহাড়ের মাঝখানে এ পানি ও বৃক্ষলতাহীন উপত্যকায় তাঁর স্ত্রী ও দুধের বাচ্চাকে নিয়ে এখানে আসেন। তিনি এখানে পাথর ও কাদা দিয়ে একটি কক্ষ নির্মাণ করেন এবং ডাক দিয়ে বলেন, আল্লাহ একে হারমে পরিণত করেছেন, এসো এ ঘরের দিকে এবং একে প্রদক্ষিণ করো। এখন ২৫ শত বছর থেকে এ জায়গাটি আরবের কেন্দ্র হয়ে রয়েছে, মারাত্মক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশে দেশের এ একটিমাত্র স্থানে নিরাপত্তা লাভ করা যায়, আরবের আবালবৃদ্ধবণিতা একে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ একে প্রদক্ষিন করার জন্য চলে আসে। এসব আল্লাহ প্রদত্ত বরকত ও সমৃদ্ধি নয়তো আর কি হতে পারে? এ নিয়ামত লাভের ফলেই তো তোমরা আরবের সরদার হয়ে গেছো এবং বিশ্ব বাণিজ্যের একটি বড় অংশ তোমাদের করতলগত হয়েছে। এখন কি তোমরা মনে করো, যে আল্লাহ তোমাদেরকে এ নিয়ামত দান করেছেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তোমরা সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে আর তাঁর দীনের অনুগত হয়ে চললেই ধ্বংস হয়ে যাবে?

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْۤ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰۤى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

আর তোমার রব জনপদগুলো ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তাদের কেন্দ্রে একজন রসূল পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াত শুনায়। আর আমি জনপদগুলো ধ্বংস করি না যতক্ষণ না সেগুলোর বাসিন্দারা জালেম হয়ে যায়।[৮৩]

তোমাদের যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা নিছক দুনিয়ার জীবনের সাজ-সরঞ্জাম এবং তার সৌন্দর্য-শোভা আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা হচ্ছে তার চেয়ে ভালো এবং অধিকতর স্থায়ী। তোমরা কি বিবেচনা করবে না?

৮২. এটি তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, যে ধনদৌলত ও সমৃদ্ধির জন্য তোমরা অহংকারী হয়ে উঠেছো এবং যার বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশংকায় বাতিলের উপরে টিকে থাকতে ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছো সেই জিনিসই এক সময় আদ, সামূদ, সাবা, মাদ্‌য়ান ও লূতের জাতির লোকদেরকে দেয়া হয়েছিল। এ জিনিস কি তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল? মোট কথা জীবন যাপনের উন্নত মানই তো একমাত্র কাম্যবস্তু নয়, যে মানুষ সত্য-মিথ্যার পরোয়া না করে শুধুমাত্র তারই পেছনে পড়ে থাকবে এবং এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে এ ইপ্সিত মুক্তোখণ্ডটি হস্তচ্যুত হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে বলেই তা অবলম্বন করতে অস্বীকার করবে। যেসব অসৎ ও ভ্রষ্টতামূলক কাজ অতীতের সমৃদ্ধিশালী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে তার ওপর টিকে থাকার প্রচেষ্টা চালিয়ে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং তাদের মতো তোমাদের ওপর কখনো ধ্বংস নেমে আসবে না এর কোন গ্যারান্টি কি তোমাদের কাছে আছে?

৮৩. এটি হচ্ছে তাদের আপত্তির তৃতীয় জবাব। পূর্বে যেসব জাতি ধ্বংস হয়েছিল তাদের লোকেরা জালেম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করার পূর্বে নিজের রসূল পাঠিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। রসূলদের সতর্ক করে দেবার পরও যখন তারা বাঁকা পথে চলা থেকে বিরত হয়নি তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তোমরা এখন এ একই অবস্থায় পতিত হয়েছো। তোমরাও জালেম হয়ে গেছো। একজন রসূল তোমাদেরকেও সতর্ক করার জন্য এসেছেন। এখন তোমরা কুফরী ও অস্বীকারের নীতি অবলম্বন করে নিজেদের আয়েশ-আরাম ও সমৃদ্ধিকে রক্ষা করতে পারবে না বরং উল্টা বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। যে ধ্বংসের আশংকা তোমরা করছো তা ঈমান আনার জন্য নয় বরং অস্বীকার করার কারণে তোমাদের ওপর আপতিত হবে।

أَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৭ রুকূ'

*আচ্ছা, যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং সে তা পেতে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি কি কখনো এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যাকে আমি কেবলমাত্র দুনিয়ার জীবনের সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছি এবং তারপর কিয়ামতের দিনের শাস্তির জন্য তাকে হাজির করা হবে ?*৮৪

*আর (তারা যেন ভুলে না যায়) সে দিনটি যখন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, "কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরীক বলে মনে করতে ?"*৮৫

৮৪. এটা হচ্ছে তাদের আপত্তির চতুর্থ জবাব। এর জবাবটি বুঝতে হলে প্রথমে দু'টি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ দুনিয়ার বর্তমান জীবন। এর সময়কাল কারো জন্যই কতকগুলো বছরের বেশী হয় না। এটি নিছক একটি সফরের সাময়িক পর্যায় মাত্র। আসল জীবনটি হবে চিরস্থায়ী। সেটি সামনের দিকে আসছে। বর্তমান সাময়িক জীবনে মানুষ যতই সহায়-সম্পদ জমা করুক না কেন এবং কয়েক বছরের এ জীবনে যতই আয়েশ আরাম করুক, এ জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবেই এবং এখানকার সমস্ত বিত্ত-বৈভব সবকিছুই এখানে রেখেই তাকে চলে যেতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত জীবনকালের আয়েশ আরামের বিনিময়ে যদি মানুষকে আগামীর অন্তহীন জীবনে চিরকালীন দুরবস্থা ও বিপদের মধ্যে কাটাতে হয়, তাহলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ক্ষতির সওদা করতে পারে না। এর মোকাবিলায় একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এখানে কয়েক বছর বিপদ আপদের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দেয়াকে প্রাধান্য দেবে। সে এর মাধ্যমে এমন সব কল্যাণ ও নেকী উপার্জন করতে চাইল, যা পরবর্তী অন্তহীন জীবনে তার চিরকালীন আয়েশ আরামের কারণ হবে।

দুই ঃ আল্লাহর দীন মানুষের কাছে দাবী করে না যে, সে এ দুনিয়ার জীবনোপকরণ থেকে লাভবান হতে পারবে না এবং এখানকার রূপ সৌন্দর্য অযথা পদদলিত করে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। তার দাবী শুধু এতটুকু যে, এ দুনিয়ার জীবনের ওপর তাকে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ভোগ-তৃপ্তি নিম্ন পর্যায়ের। পক্ষান্তরে আখেরাতের ভোগ-তৃপ্তি উচ্চ ও উন্নত পর্যায়ের। তাই মানুষকে দুনিয়ার এমন সম্পদ ও সৌন্দর্য করায়ত্ত করতে হবে যা আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তাকে সফলকাম করবে অথবা কমপক্ষে সেখানকার চিরন্তন ক্ষতির সাগরে তাকে

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

এ উক্তি যাদের ওপর প্রযোজ্য হবে[৮৬] তারা বলবে "হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই এ লোকদেরকেই আমরা গোমরাহ করেছিলাম। এদেরকে ঠিক সেভাবেই গোমরাহ করেছিলাম যেভাবে আমরা নিজেরা গোমরাহ হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায় মুক্তির কথা প্রকাশ করছি।[৮৭] এরা তো আমাদের বন্দেগী করতো না।"[৮৮] তারপর তাদেরকে বলা হবে, এবার তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়েছিলে তাদেরকে ডাকো।[৮৯] এরা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা এদের কোন জবাব দেবে না এবং এরা আযাব দেখে নেবে। হায়! এরা যদি হিদায়াত গ্রহণকারী হতো।

ভাসিয়ে দেবে না। কিন্তু যেখানে মোকাবিলার ব্যাপার এসে যায় অর্থাৎ দুনিয়ার সাফল্য ও আখেরাতের সাফল্য পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় সেখানে মানুষের কাছে সত্য দীনের দাবী এবং ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির দাবীও এটিই যে, মানুষ দুনিয়াকে আখেরাতের জন্য উৎসর্গ করে দিক এবং এ দুনিয়ার সাময়িক সম্পদ সৌন্দর্যের জন্য সে কখনো এমন পথ অবলম্বন না করুক যার ফলে তার পরকাল চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

এ দু'টি কথা সামনে রেখে দেখুন উপরের বাক্যগুলোতে আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে কি বলছেন। তিনি একথা বলছেন না যে, তোমরা নিজেদের ব্যবসায় গুটিয়ে নাও, কারবার খতম করে দাও এবং আমার নবীকে মেনে নিয়ে ফকির দরবেশ হয়ে যাও। বরং তিনি বলছেন, দুনিয়ার যে ধন সম্পদের জন্য তোমরা পাগল পারা তা অতি সামান্য সম্পদ এবং দুনিয়ার জীবনে মাত্র সামান্য ক'দিনের জন্য তোমরা তা থেকে লাভবান হতে পারো। অন্য দিকে আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা এর তুলনায় গুণগত ও পরিমাণগত (Quality and Quantity) দিক দিয়েও ভালো এবং চিরন্তন স্থায়ীত্বের অধিকারী। তাই যদি তোমরা এ সাময়িক জীবনের সীমাবদ্ধ নিয়ামত দ্বারা লাভবান হবার উদ্দেশ্যে এমন নীতি অবলম্বন করো যার ফল আখেরাতে চিরন্তন ক্ষতির আকারে ভোগ করতে হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় বোকামি আর কী হতে পারে? এক ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম করে নিজের রবের খিদমত করে এবং তারপর চিরকালের জন্য তাঁর পুরস্কার লাভ করে ধন্য হয়। আর এক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়ে আল্লাহর আদালতে অপরাধী হিসেবে আনীত হয় এবং গ্রেফতারীর পূর্বে সে নিছক কয়েকদিন হারাম সম্পদের মজা লুটবার সুযোগ পায়। এ দু'জনের মধ্যে কে সফলকাম হলো? তোমরা নিজেরাই তুলনা করে দেখে নাও।

৮৫. এ ভাষণটিও চতুর্থ জবাবের সাথেই সংশ্লিষ্ট। উপরের আয়াতের শেষ অংশের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে, নিছক নিজেদের পার্থিব স্বার্থের খাতিরে শিরক, মূর্তিপূজা ও নবুওয়াত অস্বীকারের যে গোমরাহীর ওপর তারা জোর দিচ্ছে, তার জন্য আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তাদের কেমন অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। যে অনুভূতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়েছে তাহচ্ছে এই যে, মনে করো, দুনিয়ায় তোমাদের কোন বিপদের সম্মুখীন হতে না হলেও এবং এখানকার সংক্ষিপ্ত জীবনকালে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদ ও সৌন্দর্য খুব বেশী উপভোগ করলেও যদি আখেরাতে এর পরিণাম খারাপ হওয়াই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে নিজেই ভেবে দেখো তোমরা যা কিছু করছো তা লাভজনক ব্যবসায় না পুরোপুরি ক্ষতির ব্যবসায়?

৮৬. এখানে জিন ও মানব জাতির শয়তানদের কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়েছিল, যাদের কথার মোকাবিলায় আল্লাহ ও রসূলের কথা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং যাদের ওপর ভরসা করে সরল সঠিক পথ পরিত্যাগ করে জীবনের ভুল পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। এ ধরনের লোকদেরকে কেউ ইলাহ ও রব বলুক বা না বলুক মোট কথা যখন তাদের আনুগত্য এমনভাবে করা হয়েছে যেমন আল্লাহর আনুগত্য হওয়া উচিত। তখন অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কাহ্‌ফ ৫০ টীকা)

৮৭. আমরা জোর করে এদেরকে গোমরাহ করিনি। আমরা এদের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি ছিনিয়ে নিইনি। এদের চিন্তা ও অনুধাবন শক্তিও কেড়ে নিইনি এবং এমন অবস্থারও সৃষ্টি করিনি যে, এরা সঠিক পথের দিকে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু আমরা হাত ধরে টেনে জোর করে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিলাম। বরং আমরা যেমন স্বেচ্ছায় ভুল পথ অবলম্বন করেছিলাম, তেমনি এদের সামনেও আমরা ভুল পথ পেশ করেছিলাম এবং এরা স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করেছিল। কাজেই আমরা এদের দায়িত্ব গ্রহণ করছি না। আমরা নিজেদের কাজের জন্য দায়ী এবং এরা এদের নিজেদের কাজের জন্য দায়ী।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় প্রণিধানযোগ্য। সেটি হচ্ছে আল্লাহ যদিও প্রশ্ন করবেন যারা শরীক করতো তাদেরকে। কিন্তু তারা কিছু বলার আগেই জবাব দিতে আরম্ভ করবে তাদের সেই উপাসিতরা যাদেরকে শরীক করা হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, যখন সাধারণ মুশরিকদেরকে এ প্রশ্ন করা হবে তখন তাদের নেতৃবর্গ অনুভব করবে, এবার আমাদের সর্বনাশের পালা এসে গেছে এবং আমাদের সাবেক অনুসারীরা নিশ্চয়ই এবার বলতে শুরু করবে এরাই আমাদের পথভ্রষ্টতার জন্য মূলত দায়ী। তাই অনুসারীদের বলার আগেই তারা নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে নিজেদের সাফাই পেশ করতে থাকবে।

৮৮. অর্থাৎ এরা আমাদের নয় বরং এদের নিজেদেরই প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে গিয়েছিল।

৮৯. অর্থাৎ তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকো, দুনিয়ায় তোমরা তাদের প্রতি নির্ভর করে আমার কথা রদ করে দিয়েছিলে। এখন এখানে তাদেরকে আসতে, তোমাদের সাহায্য করতে বলো এবং তোমাদেরকে আযাব থেকে বাঁচাতে বলো।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ اللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

আর তারা (যেন না ভুলে যায়) সেদিনের কথা যেদিন তিনি ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, "যে রসূল পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে?" সেদিন তাদের কোন জবাব থাকবে না, তারা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি আজ তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে সে–ই সাফল্যলাভের আশা করতে পারে।

তোমার রব যা চান সৃষ্টি করেন এবং (তিনি নিজেই নিজের কাজের জন্য যাকে চান) নির্বাচিত করে নেন। এ নির্বাচন তাদের কাজ নয়।[৯০] আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যে শির্ক করে তার অনেক উর্ধে। তোমার রব জানেন যা কিছু তারা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।[৯১]

৯০. আসলে শির্ককে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে এ উক্তি করা হয়েছে। মুশরিকরা আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টিকে তাদের উপাস্যে পরিণত করেছে। নিজেদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বিভিন্ন মর্যাদা, পদ ও গুণাবলী দান করেছে। এর প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলছেন, আমার সৃষ্ট মানুষ, ফেরেশ্‌তা, জিন ও অন্যান্য বান্দাদের মধ্য থেকে আমি নিজেই যাকে যেমন চেয়েছি গুণাবলী, যোগ্যতা ও শক্তি দান করেছি এবং যার মাধ্যমে যে কাজ নিতে চাই নিয়ে থাকি। কাজেই আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজেদের ইচ্ছামতো বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, অন্নদাতা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী ইত্যাদি মনে করার অধিকার মুশরিকরা কেমন করে ও কোথা থেকে লাভ করলো? কিভাবে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে বৃষ্টি বর্ষণ, রুজি–রোজগার ও সন্তান দান এবং রোগ ও রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা অর্পণ করে? কেমন করে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীন এলাকার একটি অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করে? আমার ক্ষমতার মধ্য থেকে যা কিছু যাকে চায় তাকে তারা কেমন করে সোপর্দ করে। কেউ ফেরেশতা, জিন, নবী বা অলী যাই কিছু থাক আমার সৃষ্টির কারণেই আছে। যে গুণাবলীই যে কেউ লাভ করেছে তা আমারই দান। যাকে আমি যে কাজে লাগাতে চেয়েছি লাগিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য এভাবে নির্বাচিত করার এ অর্থ কেমন করে হয়ে গেলো যে, এ বান্দাদেরকে বন্দেগীর স্থান থেকে

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَلَهُ الْحُكْمُ
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٧٠ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۗءٍ ۭ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝٧١
قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝٧٢
وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا
مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧٣

তিনিই এক আল্লাহ যিনি ছাড়া ইবাদাতের আর কোন হকদার নেই। তাঁরই জন্য প্রশংসা দুনিয়ায়ও, আখেরাতেও। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে। হে নবী! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর চিরকালের জন্য রাত্রিকে অব্যাহত রাখেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ মাবুদ আছে তোমাদের আলো এনে দেবে? তোমরা কি শুনছো না? তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর চিরকালের জন্য দিবস অব্যাহত রাখেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ মাবুদ আছে তোমাদের রাত্রি এনে দেবে, যাতে তোমরা তার মধ্যে বিশ্রাম করতে পারো? তোমরা কি ভেবে দেখছো না? এটা ছিল তাঁরই অনুগ্রহ, তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত ও দিন, যাতে তোমরা (রাতে) শান্তি এবং (দিনে) নিজের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, হয়তো তোমরা শোকরগুজার হবে।

উঠিয়ে খোদায়ীর মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে হবে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিতে হবে, তাদেরকে সাহায্য দান করার জন্য ডাকতে হবে, অভাব পূরণ করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানাতে হবে, তাদেরকে ভাগ্য ভাঙাগড়ার মালিক এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী আখ্যায়িত করতে হবে?

৯১. চলমান ভাষণের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি বা দল দুনিয়ার মানুষের সামনে এ দাবী করতে পারে যে, সে যে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

(তারা যেন স্মরণ রাখে) সেদিনের কথা যখন তিনি তাদেরকে ডাকবেন, তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে? আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনবো[৯২] তারপর বলবো।" আনো এবার তোমাদের প্রমাণগুলো।"[৯৩] সেসময় তারা জানবে, সত্য রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং তারা যা কিছু মিথ্যা বানিয়ে রেখেছিল তা সবই উধাও হয়ে যাবে।

বলে মনে করা হয়। তার ভ্রান্তিহীনতার ব্যাপারে অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণে সে নিশ্চিন্ত এবং তার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আর এ গোমরাহীকে সে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে নয় বরং পুরোপুরি সৎ উদ্দেশ্যে অবলম্বন করেছে এবং তার সামনে কখনো এমন কোন জিনিস আসেনি যার সাহায্যে তার ভুল তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু আল্লাহর সামনে তার এ দাবী চলতে পারে না। তিনি কেবল বাইরেরটা দেখেন না। তাঁর সামনে তো মানুষের মন ও মস্তিষ্কের এক একটি অংশ উন্মুক্ত হয়ে আছে। তিনি তার জ্ঞান, অনুভূতি, আবেগ, আকাংখা, সংকল্প, বিবেক তথা প্রত্যেকটি জিনিস সরাসরি জানেন। তিনি জানেন, কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ সময় কোন্ কোন্ পন্থায় সতর্ক করা হয়েছে, কোন্ কোন্ পথে তার কাছে সত্য পৌঁছেছে এবং কোন্ কোন্ পথে বাতিলের বাতিল হওয়ার বিষয়টি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে মূল কারণগুলোর ভিত্তিতে সে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের গোমরাহীকে প্রাধান্য দিয়েছিল সেগুলো কি ছিল তাও তিনি জানেন।

৯২. অর্থাৎ নবী, যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন। অথবা নবীদের অনুসারীদের মধ্য থেকে এমন কোন হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতের মধ্যে সত্য প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিংবা কোন প্রচার মাধ্যম যার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট উম্মতের কাছে সত্যের পয়গাম পৌঁছেছিল।

৯৩. অর্থাৎ নিজেদের সাফাইয়ের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ পেশ করো যার ভিত্তিতে তোমাদের মাফ করে দেয়া যেতে পারে। অথবা তোমরা যে শিরক এবং যে আখেরাত ও নবুওয়াত অস্বীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলে তা সঠিক ছিল এবং তোমরা যুক্তি সংগত কারণে এ পথ অবলম্বন করেছিলে একথা প্রমাণ করো। কিংবা এ না হলেও কমপক্ষে একথাই প্রমাণ করো যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে এ ভুলের জন্য সতর্ক করে দেবার এবং তোমাদের কাছে সঠিক কথা পৌঁছাবার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

৮ রুকূ'

একথা সত্য,[৯৪] কারূণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।[৯৫] আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তাদের চাবিগুলো বলবান লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো।[৯৬] একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, "অহংকার করো না, আল্লাহ অহংকারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের ঘর তৈরি করার কথা চিন্তা করো এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

৯৪. সাতান্ন আয়াত থেকে মক্কার কাফেরদের যে আপত্তি সম্পর্কে লাগাতার ভাষণ চলছে এ ঘটনাটিও তারই জবাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের কারণে জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবার ভয় প্রকাশ করেছিল তারা আসলে ছিল মক্কার বড় বড় শেঠ, মহাজন ও পুঁজিপতি। আন্তরজাতিক বাণিজ্য ও সূদী কারবার তাদেরকে সমকালীন কারূণে পরিণত করেছিল। তারাই মনে করছিল বেশী বেশী করে ধন সম্পদ আহরণ করাই হচ্ছে আসল সত্য। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে গিয়ে যে জিনিস থেকেই কিছু ক্ষতি হবার আশংকা থাকে তা সরাসরি বাতিল করতে হবে। কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে না। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ধন-সম্পদের এ উঁচু স্তম্ভগুলোকে আকাংখার দৃষ্টিতে দেখতো এবং তাদের চূড়ান্ত কামনা হতো, যে উচ্চতায় এরা পৌঁছেছে হায়। যদি আমাদের সেখানে পৌঁছুবার সৌভাগ্য হতো। চলমান অর্থ গৃধনুতার পরিবেশে এ যুক্তি বড়ই শক্তিশালী মনে করা হচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাওহীদ, আখেরাত ও নৈতিক বিধিবন্ধনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন তা মেনে নেয়া হলে কুরাইশদের উচ্চ মর্যাদার গগনচুম্বী প্রাসাদ ধূলায় লুটিয়ে পড়বে এবং এ ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্য তো দূরের কথা জীবন ধারণই কঠিন হয়ে পড়বে।

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾

এতে সে বললো, "এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।"[৯৭]—সে কি এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহু বল ও জনবলের অধিকারী ছিল?[৯৮] অপরাধীদেরকে তো তাদের গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না।[৯৯]

একদিন সে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা দুনিয়ার জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিল তারা তাকে দেখে বললো, "আহা! কারূণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরাও পেতাম! সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।" কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলতে লাগলো, "তোমাদের ভাবগতিক দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ছাড়া আর কেউ লাভ করে না।"[১০০]

৯৫. বাইবেল ও তালমূদে কারূনকে কোরহ (Korah) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চাচাত ভাই। বাইবেলের যাত্রাপুস্তকে (৬ অধ্যায় ১৮–২১ শ্লোক) যে বংশধারা বর্ণনা করা হয়েছে, তার দৃষ্টিতে বলা যায় হযরত মূসা ও কারূনের পিতা উভয়ে ছিল পরস্পর সহোদর ভাই। কুরআন মজীদের অন্য স্থানে বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অন্তরভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়েছিল এবং তার নৈকট্য লাভ করে এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতের মোকাবিলায় ফেরাউনের পরে বিরোধিতার ক্ষেত্রে যে দু'জন প্রধান দলপতি বেশী অগ্রসর ছিল তাদের একজন ছিল এ কারূন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسَى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ –

"আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি সহকারে ফেরাউন, হামান ও কারূণের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা বলল, এ একজন যাদুকর ডাহা মিথ্যুক।"
(আল–মুমিন ঃ ২৩–২৪)

এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, কারূন নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন শত্রু শক্তির ধামাধরায় পরিণত হয়েছিল, যে বনী ইসরাঈলকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। আর এ জাতীয় বিশ্বসঘাতকতার বদৌলতে ফেরাউনের রাষ্ট্রীয় প্রশানে সে এমন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছিল যে, হযরত মূসা ফেরাউন ছাড়া আর যে দু'জন বড় বড় সত্ত্বার কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের দু'জনের একজন ছিল ফেরাউনের মন্ত্রী হামান এবং অন্যজন এ ইসরাঈলী শেঠ। বাকি রাষ্ট্রের অন্য সভাসদ ও কর্মকর্তারা ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ের। কাজেই তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। কারূনের এ মর্যাদাটিই সূরা আনকাবূতের ৩৯ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৯৬. বাইবেলে (গণনা পুস্তকের ১৬ অধ্যয়) তার যে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এ ব্যক্তির ধন–দৌলতের কোন কথা বলা হয়নি। কিন্তু ইহুদী বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায়, এ ব্যক্তি অগাধ ধন–সম্পদের মালিক ছিল, এমন কি তার ধনাগারের চাবিগুলো বহন করার জন্য তিনশো খচ্চরের প্রয়োজন হতো। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ খণ্ড, ৫৫৬ পৃষ্ঠা) এ বর্ণনাটি যদিও অনেক বেশী অতিরঞ্জিত তবুও এ থেকে এতটুকু জানা যায় যে, ইসরাঈলী বর্ণনাবলীর দৃষ্টিতেও কারূন ছিল তৎকালের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি।

৯৭. আসল শব্দগুলো হচ্ছে إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, আমি যা কিছু পেয়েছি নিজের যোগ্যতার বলে পেয়েছি। এটা কোন অনুগ্রহ নয়। অধিকার ছাড়াই নিছক দয়া করে কেউ আমাকে এটা দান করেনি। তাই আমাকে এখন এজন্য এভাবে কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই যে, যেসব অযোগ্য লোককে কিছুই দেয়া হয়নি তাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবে আমি এর মধ্য থেকে কিছু দেবো অথবা আমার কাছ থেকে এ সম্পদ যাতে ছিনিয়ে নিয়ে না নেয়া হয় সেজন্য কিছু দান খয়রাত করে দেবো। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, আমার মতে আল্লাহ এই যে সম্পদরাজি আমাকে দিয়েছেন এটি তিনি আমার গুণাবলী সম্পর্কে জেনেই দিয়েছেন। যদি তাঁর দৃষ্টিতে আমি একজন পছন্দনীয় মানুষ না হতাম, তাহলে তিনি এসব আমাকে কেন দিলেন? আমার প্রতি তাঁর নিয়ামত বর্ষিত হওয়াটাই প্রমাণ করে আমি তাঁর প্রিয় পাত্র এবং আমার নীতিপদ্ধতি তিনি পছন্দ করেন।

৯৮. অর্থাৎ এ ব্যক্তি যে নিজেকে বড় পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী ও চতুর বলে দাবী করে বেড়াচ্ছে এবং নিজের যোগ্যতার অহংকারে মাটিতে পা ফেলছে না, সে কি জানে না যে, তার চাইতেও বেশী অর্থ, মর্যাদা, প্রতিপত্তি,শক্তি ও শান শওকতের অধিকারী লোক ইতিপূর্বে দুনিয়ায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? যোগ্যতা ও নৈপূণ্যই যদি পার্থিব উন্নতির রক্ষাকবচ হয়ে থাকে তাহলে যখন তারা ধ্বংস হয়েছিল তখন তাদের এ যোগ্যতাগুলো কোথায় গিয়েছিল? আর যদি কারো পার্থিব উন্নতি লাভ অনিবার্যভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তার কর্ম ও গুণাবলী পছন্দ করেন তাহলে তাদের সর্বনাশ হলো কেন?

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোন দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদালাভের আকাংখা পোষণ করছিল তারা বলতে লাগলো, "আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন।[১০১] *যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিল না, কাফেররা সফলকাম হয় না।"*[১০২]

৯৯. অর্থাৎ অপরাধীরা তো এ দাবীই করে থাকে যে, তারা বড়ই ভালো লোক। তাদের কোন দোষ আছে একথা তারা কবেই বা স্বীকার করে। কিন্তু তাদের শাস্তি তাদের স্বীকারোক্তির ওপর নির্ভর করে না। তাদেরকে যখন পাকড়াও করা হয় একথা জিজ্ঞেস করে পাকড়াও করা হয় না যে, তোমরা কি কি অপরাধ করেছ!

১০০. অর্থাৎ এ চরিত্র, চিন্তা পদ্ধতি এবং আল্লাহর পুরস্কার দান কেবলমাত্র এমন লোকদের জন্য নির্ধারিত যাদের মধ্যে এতটা ধৈর্য ও দৃঢ়তা থাকে যার ফলে তারা হালাল পথে অর্থোপার্জন করার জন্য অবিচল সংকল্পবদ্ধ হয়। চাই তাতে তাদের ভাগ্যে শুধুমাত্র নুনভাতই জুটুক, কিংবা তারা কোটিপতি হয়ে যাবার সৌভাগ্য লাভ করুক। সারা দুনিয়ার সুখ ও সুবিধা অর্জিত হবার সুযোগ দেখা দিলেও তারা হারাম পথের দিকে একটুও ঝুঁকে পড়ে না। এ আয়াতে আল্লাহর পুরস্কার বলতে এমন মর্যাদা সম্পন্ন রিযুক বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে অর্জন করে। আর সবর অর্থ হচ্ছে, নিজের আবেগ–অনুভূতি ও কামনা–বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। লোভ–লালসার মোকাবিলায় ঈমানদারী ও বিশ্বস্ততার ওপর অবিচল থাকা। সততা, ন্যায় পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার ফলে যে ক্ষতি হয় অথবা যে লাভ হাত ছাড়া হয়ে যায় তা বরদাশ্‌ত করে নেয়া। অবৈধভাবে তদবীর–তাগাদা করে যে লাভ হতে পারে তা প্রত্যাখ্যান করা। হালাল রোজগার তা যত সামান্যই হোক না কেন

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝٨٣ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٨٤

৯ রুকূ'

সে আখেরাতের [১০৩] গৃহ তো আমি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবো যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়াই চায় না[১০৪] এবং চায় না বিপর্যয় সৃষ্টি করতে।[১০৫] আর শুভ পরিণাম রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যই।[১০৬] যে কেউ ভাল কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে ভাল ফল এবং যে কেউ খারাপ কাজ নিয়ে আসে তার জানা উচিৎ যে, অসৎ কর্মশীলরা যেমন কাজ করতো ঠিক তেমনটিই প্রতিদান পাবে।

তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। হারামখোরদের জাকজমক দেখে মনের মধ্যে ঈর্ষা ও কামনা বাসনার জ্বালায় অস্থির হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র না করা এবং ঠাণ্ডা মাথায় একথা অনুধাবন করা যে, ঈমানদারের জন্য এ চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় এমন নিরাভরণ পবিত্রতাই ভালো যা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাকে দান করেছেন। "সবরকারীরা ছাড়া আর কেউ এ সম্পদ লাভ করে না" উক্তিতে উল্লেখিত সম্পদ অর্থ আল্লাহর সওয়াবও হতে পারে এবং এমন পবিত্র-পরিচ্ছন্ন মানসিকতাও হতে পারে যার ভিত্তিতে মানুষ ঈমান ও সৎকর্ম সহকারে অনাহার ও অভুক্ত থাকাকে বেঈমানীর পথ অবলম্বন করে কোটিপতি হয়ে যাওয়ার চাইতে ভালো মনে করে।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক প্রসারিত বা সংকুচিত করা যেটাই ঘটুক না কেন তা ঘটে তাঁর ইচ্ছাক্রমেই। এ ইচ্ছার মধ্যে তাঁর ভিন্নতর উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে। কাউকে বেশী রিযিক দেবার অর্থ নিশ্চিত ভাবে এ নয় যে, আল্লাহ তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাই তাকে পুরস্কার দিচ্ছেন। অনেক সময় কোন ব্যক্তি হয় আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণিত ও অভিশপ্ত কিন্তু তিনি তাকে বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত দিয়ে যেতে থাকেন। এমনকি এ ধন শেষ পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর কঠিন আযাব নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে যদি কারো রিযিক সংকুচিত হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে তার এ অর্থ হয় না যে, আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। অধিকাংশ সৎলোক আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় এ অভাব অনটন তাঁদের জন্য আল্লাহর রহমতে পরিণত হয়েছে। এ সত্যটি না বোঝার ফলে যারা আসলে আল্লাহর গযবের অধিকারী হয় তাদের সমৃদ্ধিকে মানুষ ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

হে নবী! নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কুরআন তোমার ওপর ন্যস্ত করেছেন[১০৭] তিনি তোমাকে একটি উত্তম পরিণতিতে পৌঁছিয়ে দেবেন।[১০৮] তাদেরকে বলে দাও, "আমার রব ভালো করেই জানেন কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।" তুমি মোটেই আশা করোনি যে, তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। এতো নিছক তোমার রবের মেহেরবানী (তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে)[১০৯], কাজেই তুমি কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না।[১১০]

১০২. অর্থাৎ আমাদের এ ভুল ধারণা ছিল যে, পার্থিব সমৃদ্ধি ও ধনাঢ্যতাই সফলতা। এ কারণে আমরা মনে করে বসেছিলাম কারূন বড়ই সাফল্য অর্জন করে চলছে। কিন্তু এখন বুঝলাম, আসল সাফল্য অন্য কোন জিনিসের নাম এবং তা কাফেরদের ভাগ্যে জোটে না।

কারূনের ঘটনার এ শিক্ষনীয় দিকটি কেবলমাত্র কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে। বাইবেল ও তালমূদে এর কোন উল্লেখ নেই। তবে এ দু'টি কিতাবে যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তা থেকে জানা যায়, বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয় তখন এ ব্যক্তিও নিজের দলবলসহ তাদের সাথে বের হয়; তারপর সে হযরত মূসা ও হারূনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করে। আড়াইশ' লোক এ ষড়যন্ত্রে তার সাথে শরীক ছিল। শেষ পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয় এবং সে নিজের গৃহ ও ধন-সম্পদসহ মাটির মধ্যে প্রোথিত হয়ে যায়।

১০৩. এখানে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, যা প্রকৃত সাফল্যের স্থান হিসেবে চিহ্নিত।

১০৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী নয়। যারা বিদ্রোহী, স্বৈরাচারী ও দাম্ভিক হয়ে নয় বরং বান্দা হয়ে থাকে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের বান্দা করে রাখার চেষ্টা করে না।

১০৫. 'ফাসাদ' বা বিপর্যয় হচ্ছে মানব জীবন ব্যবস্থার এমন একটি বিকৃতি যা সত্য বিচ্যুত হবার ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। আল্লাহর বন্দেগী এবং তাঁর আইন কানুনের আনুগত্যের সীমানা অতিক্রম করে মানুষ যা কিছুই করে সবই হয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই বিপর্যয়। এর একটি অংশ হচ্ছে এমন ধরনের বিপর্যয়, যা হারাম পথে ধন আহরণ এবং হারাম পথে তা ব্যয় করার ফলে সৃষ্টি হয়।

১০৬. অর্থাৎ তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তার নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকে।

১০৭. অর্থাৎ এই কুরআনকে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছাবার, তাদেরকে এর শিক্ষা দান করার এবং এর পথ নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ব সংস্কার করার দায়িত্ব তোমার প্রতি অর্পণ করেছেন।

১০৮. আসল শব্দ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ অর্থাৎ তোমাকে একটি মা'আদের দিকে পৌঁছিয়ে দেবেন। মা'আদ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন স্থান যেদিকে মানুষকে ফিরে যেতে হবে। এ শব্দটিকে অনির্দিষ্ট বাচক পদ হিসেবে ব্যবহার করার কারণে এর দ্বারা আপনা আপনি এ অর্থ বুঝানো হয় যে, এ স্থানটি বড়ই মহিমান্বিত ও মর্যাদা সম্পন্ন। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন জান্নাত। কিন্তু একে শুধুমাত্র জান্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। আল্লাহ শব্দটিকে যেমন ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করেছেন তেমনি ব্যাপক অর্থে একে ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে এ প্রতিশ্রুতি দুনিয়া ও আখরাত উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। আয়াতের পূর্ববর্তী আলোচনাও এ কথাই দাবী করে যে, একে কেবলমাত্র আখেরাতেই নয় বরং দুনিয়াতেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরাট শান শওকত এবং মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করার প্রতিশ্রুতি মনে করা হোক। মক্কার কাফেরদের যে উক্তি নিয়ে ৫৭ আয়াত থেকে এ পর্যন্ত লাগাতার আলোচনা চলছে তাতে তারা বলেছিল, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি নিজের সাথে আমাদেরকেও নিয়ে ডুবতে চাও। যদি আমরা তোমার সাথে সহযোগিতা করি এবং এ ধর্ম গ্রহণ করে নিই, তাহলে আরবের সরযমীনে আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। এর জবাবে আল্লাহ তাঁর নবীকে বললেন, হে নবী! যে আল্লাহ এ কুরআনের পতাকা বহন করার দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করেছেন তিনি তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন না। বরং তিনি তোমাকে এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চান যার কল্পনাও আজ এরা করতে পারে না। আর প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ মাত্র কয়েক বছর পর নবী করীমকে (সা) এ দুনিয়ায় এদেরই চোখের সামনে সমগ্র আরব দেশে এমন নিরংকুশ কর্তৃত্ব দান করলেন যে, তাঁকে বাধাদানকারী কোন শক্তিই সেখানে টিকতে পারলো না এবং তাঁর দীন ছাড়া অন্য কোন দীনের জন্য সেখানে কোন অবকাশই থাকলো না। আরবের ইতিহাসে এর আগে সমগ্র আরব উপদ্বীপে কোন এক ব্যক্তির একচ্ছত্র আধিপত্যের এ ধরনের কোন নজীর সৃষ্টি হয়নি, যার ফলে সারা দেশে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেনি, তার হুকুমের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা কেউ রাখেনি এবং লোকেরা কেবল রাজনৈতিকভাবেই তার দলভুক্ত হয়নি বরং সমস্ত দীনকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সেই এক ব্যক্তি সবাইকে তার দীনের অনুসারীও করে নিয়েছে।

কোন কোন মুফাস্সির এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সূরা কাসাসের এ আয়াতটি মক্কা থেকে মদীনার দিকে হিজরাত করার সময় পথে নাযিল হয়েছিল। তাদের মতে এতে আল্লাহ তাঁর নবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি আবার তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু প্রথমত এর শব্দাবলীর মধ্যে "মা'আদ" কে "মক্কা" অর্থে গ্রহণ করার কোন সুযোগই নেই। দ্বিতীয়ত বিষয়বস্তু ও আভ্যন্তরীণ সাক্ষ-প্রমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে এ সূরাটি হচ্ছে হাবশায় হিজরাতের নিকটবর্তী সময়ের এবং একথা বুঝা যাচ্ছে না যে,

কয়েক বছর পরে মদীনায় হিজরাতের সময় পথে যদি এ আয়াতটি নাযিল হয়ে থাকে তাহলে কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে এ ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে একে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত এ প্রেক্ষাপটে মক্কার দিকে নবী করীমের (সা) ফিরে যাবার আলোচনা একেবারেই বেমানান ঠেকে। আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করা হলে এটা মক্কার কাফেরদের কথার জবাব হবে না বরং তাদের ওজরকে শক্তিশালী করা হবে। এর অর্থ হবে, অবশ্যই হে মক্কাবাসীরা! তোমরা ঠিকই বলছো, মুহাম্মাদ (সা) কে এ শহর থেকে বের করে দেয়া হবে কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে নির্বাসিত হবেন না বরং শেষ পর্যন্ত আমি তাকে আবার এখানে ফিরিয়ে আনবো। এ হাদীসটি যদিও বুখারী, নাসাঈ, ইবনে জারীর ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু আসলে এটি ইবনে আব্বাসের নিজস্ব অভিমত। এটি সরাসরি রসূল (সা) এর বক্তব্য সম্বলিত কোন মারফূ হাদীস নয় যে, একে মেনে নিতেই হবে।

১০৯. একথাটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হচ্ছে। মূসা আলাইহিস সালাম এ কথা মোটেই জানতেন না যে, তাঁকে নবী করা হচ্ছে এবং বিরাট দায়িত্ব সম্পাদনে নিযুক্ত করা হচ্ছে। তিনি কখনো কল্পনায়ও এ ইচ্ছা বা আশা পোষণ করা তো দূরের কথা কখনো এ বিষয়টি কামনাও করেননি। হঠাৎ পথ চলার সময় তাঁকে ডেকে নেয়া হয় এবং নবীর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তাঁর থেকে বিস্ময়কর কাজ নেয়া হয়, যার সাথে তার পূর্ববর্তী জীবনের কাজের কোন সাদৃশ্যই ছিল না। ঠিক একই ঘটনা ঘটে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও। মক্কার লোকেরা নিজেরাই জানতো, হেরা গিরিগুহা থেকে যেদিন তিনি নবুওয়াতের পয়গাম নিয়ে নেমে আসেন তার মাত্র একদিন আগে পর্যন্ত তাঁর জীবন কি ছিল, তিনি কি কাজ করতেন, কেমন কথাবার্তা বলতেন, তাঁর কথাবার্তার বিষয়বস্তু কি হতো, কোন্ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল এবং তাঁর তৎপরতা ছিল কোন্ ধরনের। তাঁর এ সমগ্র জীবন অবশ্যই সত্যতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতায় পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে পরিপূর্ণ ভদ্রতা, শালীনতা, শান্তিপ্রিয়তা, প্রতিশ্রুতি পালন, অধিকার প্রদান ও জনসেবার ভাবধারা অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান ছিল। কিন্তু সেখানে এমন কোন জিনিস ছিল না যার ভিত্তিতে কেউ একথা কল্পনাও করতে পারে যে, এ সদাচারী লোকটি আগামীকাল নবুওয়াতের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসবেন। তাঁর সাথে যারা নিকটতম সম্পর্ক রাখতো এবং তাঁর আত্মীয়–স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশী ও বন্ধু–বান্ধবদের মধ্যে একজনও একথা বলতে পারেনি যে, তিনি পূর্ব থেকেই নবী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হেরা গিরিগুহার সেই বৈপ্লবিক মুহূর্তের পরে অকস্মাত যেসব বিষয়বস্তু, সমস্যাবলী ও প্রসংগ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিবৃতি ও ভাষণ দান শুরু হয়ে যায় ইতিপূর্বে কেউ তাঁর কন্ঠ থেকে কখনো তার একটি বর্ণও শোনেনি। কুরআনের আকারে অকস্মাত তাঁর মুখ থেকে যে বিশেষ ভাষা, শব্দ ও পরিভাষা লোকেরা শুনতে থাকে ইতিপূর্বে কখনো তারা তা শোনেনি। ইতিপূর্বে কখনো তিনি কোথাও বক্তৃতা ও ওয়াজ--নসিহত করতে দাঁড়াননি। কখনো দাওয়াত দিতে ও আন্দোলনের বাণী নিয়ে এগিয়ে আসেননি। বরং কখনো তাঁর কোন কর্মতৎপরতা থেকে এ ধারণাই জন্মাতে পারেনি যে, তিনি সামাজিক সমস্যা সমাধান অথবা ধর্মীয় সংশোধন কিংবা নৈতিক ও চারিত্রিক সংস্কার সাধনের জন্য কোন কাজ শুরু করার চিন্তা–ভাবনা করছেন। এ বৈপ্লবিক মুহূর্ত সমাগত হবার একদিন আগেও তাঁর জীবন ছিল

একজন ব্যবসায়ীর জীবন। সাদামাটা ও বৈধ পথে রুজী-রোজগার করা, নিজের সন্তান-পরিজনদের সাথে হাসিখুশির জীবন যাপন করা, অতিথি আপ্যায়ন করা, দুঃখী-দরিদ্র জনদের সাহায্য সেবা করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা আর কখনো কখনো ইবাদাত করার জন্য একান্তে বসে যাওয়া– এই ছিল তাঁর স্বাভাবিক জীবন। এ ধরনের একজন লোকের হঠাৎ একদিন বিশ্ব কাঁপানো বাগ্মীতা নিয়ে ময়দানে নেমে আসা, একটি বিপ্লবাত্মক দাওয়াতের কাজ শুরু করে দেয়া, একটি অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করা এবং একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শন চিন্তাধারা ও নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধান নিয়ে সামনে এগিয়ে আসা, এতবড় একটি পরিবর্তন, যা মানবিক মনস্তত্বের দৃষ্টিতে কোন প্রকার কৃত্রিমতা, প্রস্তুতি ও ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কখনোই আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কারণ এ ধরনের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি অবশ্যই পর্যায়ক্রমিক ক্রমোন্নতির স্তর অতিক্রম করে এবং যাদের মধ্যে মানুষ রাত্রি-দিন জীবন-যাপন করে এ পর্যায় ও স্তর কখনো তাদের চোখের আড়ালে থাকতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন যদি এ পর্যায়গুলো অতিক্রম করে থাকতো তাহলে মক্কার হাজার হাজার লোক বলতো, আমরা না আগেই বলেছিলাম এ ব্যক্তি একদিন কোন বড় আকারের দাবী করে বসবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মক্কার কাফেররা তাঁর বিরুদ্ধে সব ধরনের অভিযোগ আনলেও এ অভিযোগটি তাদের একজনও উত্থাপন করেনি।

তারপর তিনি নিজেও নবুওয়াতের প্রত্যাশী ছিলেন না। অথবা তা কামনা করতেন না এবং সেজন্য অপেক্ষাও করছিলেন না। বরং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অকস্মাত তিনি এ বিষয়টির মুখোমুখি হলেন। বিভিন্ন হাদীসে অহীর সূত্রপাতের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে যে ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। জিব্রীলের সাথে প্রথম সাক্ষাত এবং সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর তিনি হেরা গুহা থেকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গৃহে পৌঁছেছিলেন। গৃহের লোকদের বলেছিলেন, "আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও।" কিছুক্ষণ পরে ভীতির অবস্থা কিছুটা দূর হয়ে গেলে নিজের জীবন সঙ্গিনীকে সব অবস্থা খুলে বললেন। এ প্রসঙ্গে তাঁকে বললেন, "আমি নিজের প্রাণের ভয় করছি।" স্ত্রী সংগে সংগেই জবাব দিলেন, "মোটেই না, আল্লাহ আপনাকে কখনো কষ্ট দেবেন না। আপনি আত্মীয়দের হক আদায় করেন। অসহায়কে সাহায্য করেন। অভাবী দরিদ্রকে সহায়তা দেন। অতিথি আপ্যায়ন করেন। প্রত্যেক ভালো কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন।" তারপর তিনি তাঁকে নিয়ে নিজের চাচাত ভাই ও আহলে কিতাবদের একজন অভিজ্ঞ আলেম ও সদাচারী ব্যক্তি ওয়ারাকাহ ইবনে নওফালের কাছে গেলেন। তাঁর কাছ থেকে পুরো ঘটনা শোনার পর ওয়ারাকাহ বললেন, "আপনার কাছে যিনি এসেছিলেন তিনি ছিলেন সেই আসমানী দূত বা নামুস (বিশেষ কাজে নিযুক্ত নির্দিষ্ট ফেরেশ্‌তা) যিনি মূসার (আ) কাছে এসেছিলেন। হায় ! যদি আমি যুবক হতাম এবং সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে বহিষ্কার করবে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কি আমাকে বের করে দেবে ?" জবাব দিলেন, "হাঁ আজ পর্যন্ত এক ব্যক্তিও এমন অতিক্রান্ত হননি, যিনি এ ধরনের বাণী বহন করে [illegible]ছেন, এবং লোকেরা তাঁর দুশমনে পরিণত হয়নি।

এ সমগ্র ঘটনাটি এমন একটি অবস্থার ছবি তুলে ধরে, যা একজন সরল মানুষ একটি অপ্রত্যাশিত ও চরম অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলে তার জীবনে দেখা দিতে পারে। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম থেকেই নবী হবার চিন্তা করতেন, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতেন যে, তাঁর মতো মানুষের নবী হওয়া উচিত এবং কবে কোন্ ফেরেশতা তাঁর কাছে পয়গাম নিয়ে আসবে তারি প্রতীক্ষায় ধ্যান সাধনা করে নিজের মনের ওপর চাপ প্রয়োগ করতেন, তাহলে হেরা গুহার ঘটনা সংঘটিত হবার সাথে সাথেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন এবং বলিষ্ঠ মনোবল নিয়ে বিরাট দাবী সহকারে পাহাড় থেকে নামতেন, তারপর সোজা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে পৌঁছে নিজের নবুওয়াতের ঘোষণা দিতেন। কিন্তু এখানে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। তিনি যা কিছু দেখেন তাতে বিস্মিত ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে পৌঁছেন। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। মনটা একটু শান্ত হলে চুপিচুপি স্ত্রীকে বলেন, আজ গুহার নিসংগতায় এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে গেছে। জানি না কি হবে। আমার প্রাণ নিরাপদ নয় মনে হচ্ছে। নবুওয়াত প্রার্থীর অবস্থা থেকে এ অবস্থা কত ভিন্নতর।

তারপর স্বামীর জীবন, তার অবস্থা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে স্ত্রীর চেয়ে বেশী আর কে জানতে পারে? যদি তিনি পূর্বাহ্নেই এ অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকতেন যে, তাঁর স্বামী হচ্ছেন নবুওয়াতের প্রার্থী, তিনি সর্বক্ষণ ফেরেশতার আগমনের প্রতীক্ষা করছেন, তাহলে তাঁর জবাব কখনো হযরত খাদীজার (রা) জবাবের অনুরূপ হতো না। বরং তিনি বলতেন ঃ হে স্বামী! ভয় পাও কেন? দীর্ঘদিন থেকে যে জিনিসের প্রত্যাশী ছিলে তা পেয়ে গেছো। চলো, এবার পীর গিরির দোকান পাঠ সাজাও। আমি মানত, নজরানা ইত্যাদি সামলানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু পনের বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি স্বামীর জীবনের যে চেহারা দেখেছিলেন তার ভিত্তিতে এ কথা বুঝতে তাঁর এক মুহূর্তও দেরী হয়নি যে, এমন সৎ, ত্যাগী ও নির্লোভ ব্যক্তির কাছে শয়তান আসতে পারে না, আল্লাহ তাঁকে কোন বড় পরীক্ষার সম্মুখীনও করতে পারেন না বরং তিনি যা কিছু দেখেছেন তা নির্জলা সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওয়ারাকাহ ইবনে নওফালের ব্যাপারেও একই কথা। তিনি কোন বাইরের লোক ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন নবী করীমের (সা) ভ্রাতৃসমাজের অন্তরভুক্ত এবং নিকটতম আত্মীয়তার প্রেক্ষিতে তাঁর শ্যালক। তারপর একজন ঈসায়ী আলেম হবার ফলে নবুওয়াত, কিতাব ও অহীকে কৃত্রিমতা ও বানোয়াট থেকে বাছাই করার ক্ষমতা রাখতেন। বয়সে অনেক বড় হবার কারণে নবীর (সা) শৈশব থেকে সে সময় পর্যন্তকার সমগ্র জীবন তাঁর সামনে ছিল। তিনিও তাঁর মুখ থেকে হেরা গুহার সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক শোনার পর সংগে সংগেই বলে ওঠেন, এ আগমনকারী নিশ্চিতভাবেই সেই একই ফেরেশতা হবেন যিনি হযরত মূসার (আ) কাছে অহী নিয়ে আসতেন। কারণ হযরত মূসার (আ) সাথে যা ঘটেছিল এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ একজন অত্যন্ত পবিত্র পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী সহজ সরল মানুষ, মাথায় কোন প্রকার পূর্ব চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই, নবুওয়াতের চিন্তায় ডুবে থাকা তো দূরের কথা তা অর্জন করার কল্পনাও কোনদিন

মনে জাগেনি এবং অকস্মাত তিনি পূর্ণ সচেতন অবস্থায় প্রকাশ্যে এ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। এ জিনিসটি তাঁকে দুই আর দু'ইয়ে চারের মতো নির্দ্বিধায় নিশ্চিতভাবেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে দেয় যে, এখানে কোন প্রবৃত্তির প্ররোচনা বা শয়তানী ছল চাতুরী নেই। বরং এ সত্যাশ্রয়ী মানুষটি নিজের কোন প্রকার ইচ্ছা–আকাংখা ছাড়াই যা কিছু দেখেছেন তা আসলে প্রকৃত সত্যদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের এমন একটি সুস্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, একজন সত্যপ্রিয় মানুষের পক্ষে একে অস্বীকার করা কঠিন। তাই কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এ জিনিসটিকে নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّوْشَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ –

"হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, যদি আল্লাহ এটা না চাইতেন, তাহলে আমি কখনো এ কুরআন তোমাদের শুনাতাম না বরং এর খবরও আমি তোমাদের দিতাম না; ইতিপূর্বে আমি তোমাদের মধ্যে আমার জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তোমরা কি এতটুকু কথাও বোঝো না?" (ইউনুস ঃ ১৬ আয়াত)

আর সূরা আশ্–শূরায় বলা হয়েছে,

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا –

"হে নবী! তুমি তো জানতেও না কিতাব কি এবং ঈমানই কি। কিন্তু আমি এ অহীকে একটি আলোয় পরিণত করে দিয়েছি। যার সাহায্যে আমি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চাই তাকে পথ দেখাই।" (আশ্–শূরা ঃ ৫২ আয়াত)।

[আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস ২১, আনকাবুত ৮৮–৯২ এবং শূরা ৮৪ টীকা।]

১১০. অর্থাৎ আল্লাহ যখন না চাইতেই তোমাদের এ নিয়ামত দান করেছেন তখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তোমাদের সমস্ত শক্তি ও শ্রম এর পতাকা বহন করার এবং এর প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যয় করবে এ কাজে ক্রটি ও গাফলতি করার মানে হবে তোমরা সত্যের পরিবর্তে সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সাহায্য করেছো। এর অর্থ এ নয়, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ধরনের কোন ভুলের আশংকা ছিল। বরং এভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের নবীকে এ হিদায়াত দান করছেন যে, এদের শোরগোল ও বিরোধীতা সত্ত্বেও তুমি নিজের কাজ করে যাও এবং তোমার এ দাওয়াতের ফলে সত্যের দুশমনরা তাদের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবার যেসব আশংকা প্রকাশ করে তার পরোয়া করার কোন প্রয়োজন নেই।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٨٧ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٨٨

আর এমনটি যেন কখনো না হয় যে, আল্লাহর আয়াত যখন তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয় তখন কাফেররা তোমাকে তা থেকে বিরত রাখে।[১১১] নিজের রবের দিকে দাওয়াত দাও এবং কখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র তাঁর সত্তা ছাড়া। শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই[১১২] এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

১১১. অর্থাৎ সেগুলোর প্রচার ও প্রসার থেকে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা থেকে।

১১২. এ অর্থও হতে পারে, শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই জন্য অর্থাৎ একমাত্র তিনিই তার অধিকার রাখেন।